

কাজী নজরুল
প্রসঙ্গে
(স্মৃতিকথা)

মুজফ্ফর আহমদ



2609

N/329

6119



কাজী নজরুল প্রসঙ্গে

(স্মৃতি কথা)

মুজফ্ ফর আহমদ



বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৩৬৬

॥ প্রকাশক ॥

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

২০, গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা-৫

॥ প্রচ্ছদ ॥

শ্রীমল সেন

২৫.৫.৭৭
৪৩৭৩

॥ মুদ্রক ॥

জ্যোতির্ষয় চট্টোপাধ্যায়

পি, এম্, বাগচী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৩৮-এ, মসজিদ বাড়ী স্ট্রিট

কলিকাতা-৬

॥ চার টাকা ॥



~~2609~~

~~329~~

~~611A~~

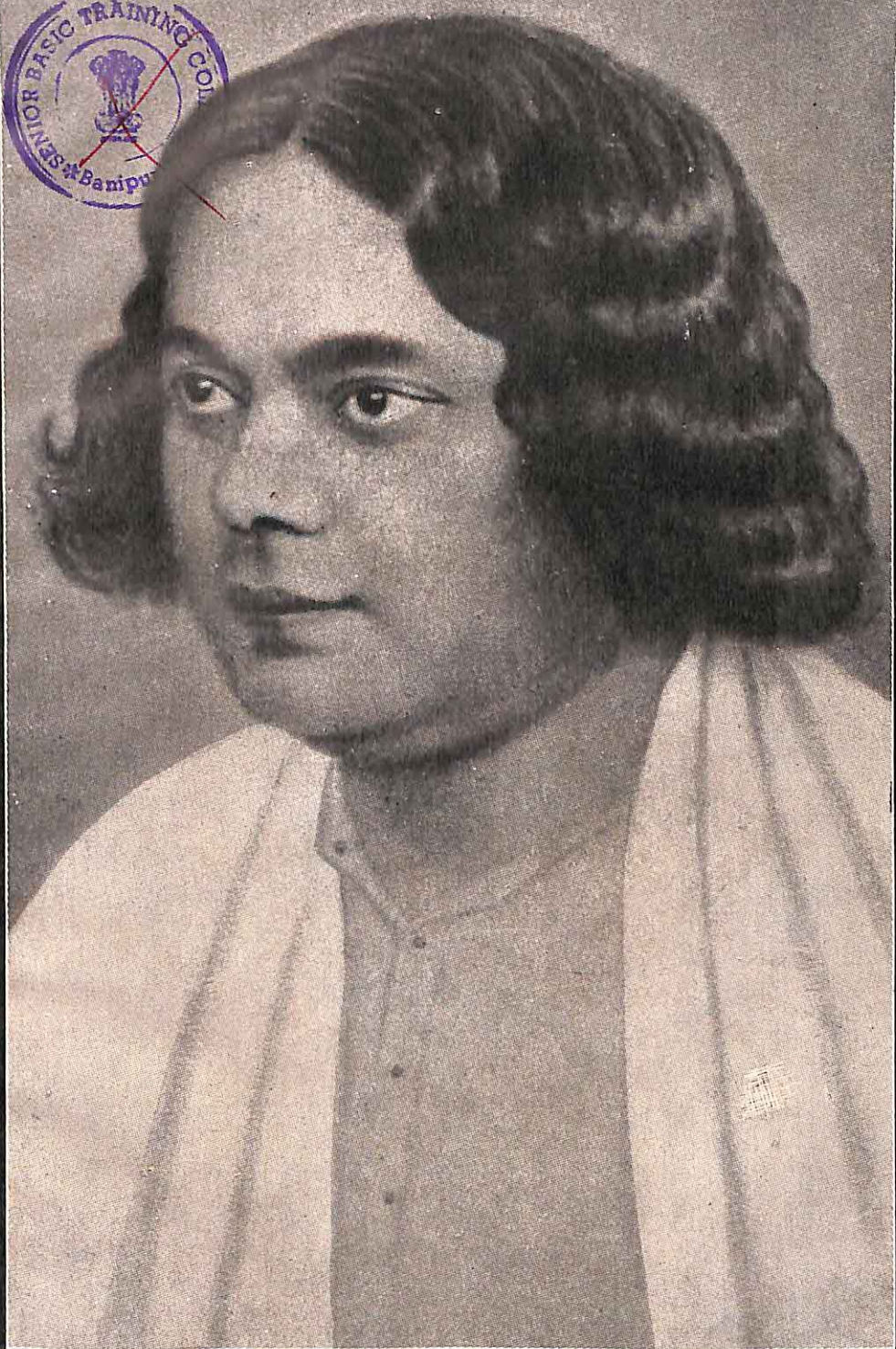
আবদুল হালীমাক

~~598~~

নজরুল জামদাশ

১১ই জৈষ্ঠ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

২৬শে মে, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ



ৰাজী নচৰাল ইসলাম



6114
595

জনাব আজহার উদ্দীন খানের লেখা “বাংলা সাহিত্যে নজরুল” প্রকাশিত হওয়ার পরেও আমার মতে কবি নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত এখনও রচিত হয়নি। সেই চেষ্টা হওয়া আবশ্যিক। কবি আজ জীবিত হলেও তার বাণী চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেশের দুর্ভাগ্যবশত কবি আজ হতসম্মিত ও বাকশক্তিহীন। সে তার নিজের সম্পর্কে কোনো কিছু আমাদের আর জানাতে পারবে না। এই অবস্থায় কবির মাত্র দু’ একজন বন্ধুর নিকট হ’তে তথ্য সংগ্রহ ক’রে তার পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত লেখার চেষ্টা কারুর করা উচিত নয়। কবির পরিচয়ের পরিধি স্তব্ধ। যারা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে পারবেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁরা যদি কবির সম্বন্ধে যা যা জানেন সেই সব কথা লিপিবদ্ধ করেন তবে এই লেখাগুলিই হবে কবির পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রকৃত মাল-মসলা। এই জাতীয় লেখাগুলি হ’তেই শুধু এক বা একাধিক ব্যক্তি কবির পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার চেষ্টা করতে পারবেন। তবে স্মৃতি অনেক সময়ে মানুষকে বড় বিভ্রান্ত ক’রে দেয়। আমরা এমনও দেখেছি, যার যে-ঘটনা মোটেই জানা নয় সে-ঘটনা তাঁর বিশেষভাবে জানা ব’লে তাঁর মন বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। কাজেই, স্মৃতিকথা বলার সময়ে আমাদের প্রত্যেকেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

আজকাল নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেনও। বড় দুঃখ যে এই সব লেখার ভিতরে কিছু কিছু লেখা নিছক কল্পনা-প্রসূত। এই জাতীয় কল্পনা-বিলাস বন্ধ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মাসিক কাগজের বা অগ্র কাগজের পরিচালকেরা যদি কিস্তিৎ সতর্কতা অবলম্বন করেন তবেই এই জাতীয় লেখার প্রকাশ বন্ধ হওয়া সম্ভব।

ভবিষ্যতে যারা নজরুল ইসলামের জীবনী লেখায় ত্রুটি হবেন তাঁদের

কিঞ্চিৎ সাহায্য হতে পারে এই ভেবে আমি তার সম্বন্ধে আমার স্মৃতি-
কথার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করছি।

কবি নজরুল ইসলামের বাল্য জীবন সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই।
তবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সে-জীবন অত্যন্ত দারিদ্র্যব্লিষ্ট
ছিল। তা না হলে কাজীদের বাড়ীর ছেলে পরসার জন্তো লেটোর দলে
গান গাইতে যেতো না, কিংবা আসানসোলে রুটির কারখানায় ছোকরা
মজুরের কাজও নিত না। সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মুসলিম সমাজে
কাজীরা মানভাজন লোক। অন্তত নজরুল ইসলামের বাল্যকালে তাঁরা
তাই ছিলেন। তার এই দুঃখের জীবনই মাটির মানুষদের সঙ্গে তার
সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছিল। এর বহু বৎসর পরে, ১৯২৬ কিংবা
১৯২৭ সালে নজরুল তার “দারিদ্র্য” শীর্ষক কবিতায় লিখেছে :—

“হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্!

তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান

কণ্টক-মুকুট শোভা। —দিয়াছ, তাপস,

অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;

উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,

বীণা মোর শাপে তব হ’ল তরবার!”

✱

✱

✱

✱

এই কবিতাটি “কল্লোল” পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। নজরুল
সে-সময়ে কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) থাকত। “কল্লোল”-এর প্রাণস্বরূপ শ্রীযুত
দীনেশরঞ্জন দাশ একটি কবিতার জন্তে মনিঅর্ডার বোগে নজরুলকে দশটি
টাকা পাঠিয়েছিলেন। কলকাতার ৩৭ নম্বর হারিসন রোডের বাড়ীতে
কবিতাটি “কল্লোলে” পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্তে সে আমার হাতে দিয়ে
যায়। যদিও “কল্লোল” আফিস খুবই নিকটে ছিল তবুও সেবারে সে
“কল্লোল” আফিসে যায়নি।

প্রথম পরিচয়

১৯১৮ সালে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন সে করাচির সেনা-নিবাসে ৪৯ নম্বর বাঙালী পণ্টনের (49th. Bengali Regiment) সৈনিক ছিল। সে এই পণ্টনের কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারের পদে উন্নীত হয়েছিল। পণ্টনের সৈনিকদের কঠোর শৃঙ্খলার জীবন যাপন করতে হয়। তা সত্ত্বেও পণ্টনে থাকা কালে নজরুল সাহিত্য চর্চা করত। সে তার লেখা গল্প ও কবিতা কাঁগজে ছাপাবার জন্যেও পাঠাত। তখনকার দিনে “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি” নামক একটি সাহিত্য-সংগঠন ছিল। তার আফিস ছিল কলকাতার ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীর দোতলার সামনের দিককার অংশে। “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা” নাম দিয়ে এই সমিতির তরফ হতে একখানা ত্রিমাসিক মুখপত্র বা’র করা হতো। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব (পরে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) ও ভোলার মুহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। মোজাম্মেল হক সাহেব সাহিত্য সমিতিরও সম্পাদক ছিলেন। আমি ছিলাম সমিতির সহকারী সম্পাদক ও একমাত্র সব-সময়ের কর্মী। ত্রি-মাসিক কাগজখানা বা’র করার সব কাজ আমায় করতে হতো। মাঝে মাঝে তার কিঞ্চিৎ সম্পাদনাও যে আমি করতাম না তা নয়। “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা”র এই কাজের কল্যাণেই কাজী নজরুল ইসলামের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। করাচির সেনা-নিবাস হ’তে নজরুল তার কবিতা ও গল্প এই কাগজে ছাপাবার জন্যে পাঠাত। তার লেখা প’ড়ে আমাদের মনে ধারণা হয়েছিল যে বাঙলা সাহিত্য-জগতে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে একজন কবি ও লেখকের আবির্ভাব হচ্ছে। তাই তার সব লেখাই আমরা পরম আগ্রহ সহকারে সাহিত্য পত্রিকায়

ছেপেছিলেম। তার “মুক্তি” শীর্ষক কবিতা সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, আর ছাপা হয়েছিল তার “হেনা” ও “ব্যথার দান” শীর্ষক গল্প। “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা”র অস্তিত্ব যতদিন ছিল ততদিন নজরুল ইসলামের কিছু না কিছু লেখা তার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছে। এই পত্রিকার ১৩৩০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বা’র হয়েছে :—

“জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ
খেলছে জুয়া।

ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের
হাতের নয়’ক মোয়া।”

“হেনা” ও “ব্যথার দান” শীর্ষক গল্প দু’টি নজরুলের “ব্যথার দান” নামক গল্প পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

কেউ কেউ লিখেছেন পন্টনে নাম লিখিয়েই কাজী নজরুল ইসলাম সোজা করাচি চলে গিয়েছিল। একথা সত্য নয়। ভারতের ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই বাঙালীদের পন্টনে ভর্তি করতে চাইত না, বাঙালীরা আন্দোলন করতেন যে তাঁদের পন্টনে ভর্তি করা হো’ক। এইরূপ আন্দোলনের চাপে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকার স্থির করে যে তারা একটি বাঙালী ডবল কোম্পানী গঠন করবে। এই প্রথম ডবল কোম্পানীতেই নজরুল তার নাম লিখিয়েছিল। সৈনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্যে নজরুলদের প্রথমে পেশোয়ারের নিকটবর্তী নৌশহরাতে পাঠানো হয়েছিল, করাচিতে নয়। ক্রমে বেঙ্গলী ডবল কোম্পানী বড় হয়ে ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্টে পরিণত হয়েছিল এবং এই রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছিল করাচিতে। প্রথম গঠিত ডবল কোম্পানীর সৈনিকরা যখন নৌশহরা অভিযুক্ত রওয়ানা হ’তে যাচ্ছিলেন তখন কলকাতার নাগরিকদের তরফ হ’তে কলকাতা টাউন হলে তাঁদের একটি বিদায় সংবধনা জানানো হয়েছিল। আমার মনে আছে আমি এই সংবধনা সভায় যোগ দিয়েছিলেম। তার মানে এই নয় যে নজরুলের সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ছিল।

“বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা”র ছাপানোর জন্যে নজরুল যখন প্রথম লেখা পাঠিয়েছিল (১৯১৮ সনে) তখন হ’তেই তার সঙ্গে আমার পত্র লেখালেখি শুরু হয়। আমি তার “ব্যথার দান” গল্পটির একটি কথার পরিবর্তন করেছিলাম। এই ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আমার চিঠি-পত্রের পরিচয় চিঠি-পত্রের বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আমার পরিবর্তন নজরুলের খুব পসন্দ হয়েছিল। এই সম্বন্ধে আমি পরে লিখব। আমাদের অদেখা বন্ধুত্ব হলেও আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। নজরুল ক্রমশ তার ব্যক্তিগত ব্যাপারও আমায় লেখা শুরু করেছিল। ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট তুলে দেওয়ার কথাবার্তা চলছিল। রেজিমেণ্ট উঠে গেলে নজরুল কোথায় যাবে, কি করবে, এই সব কথা আমাদের মধ্যে আলোচনা হতো। আমি তাকে লিখতুম আমার মতে তো বটেই, আরও অনেকের মতেও, নজরুলের মধ্যে একটা বিরাট সাহিত্যিক সম্ভাবনা আছে। কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশেই তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। কাজেই কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত তার গ্রহণ করা উচিত। সে লিখত সে-সিদ্ধান্তই না হয় নিলুম, কিন্তু খাওয়া-পরার কি উপায় হবে? জওয়াবে আমি তাকে লিখতেম খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা হবেই। কলকাতা শহর অথই সমুদ্র নয়, শুকনো ডাঙা মাত্র। সে সময়ে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নজরুলকে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্য সব হিসাব খতিয়ে দেখার মনোবৃত্তি তখন আমার ছিল না।

প্রথম দেখা

বাঙালী পণ্টন ভেঙে দেওয়ার কয়েক মাস আগে, ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে, নজরুল ইসলাম পণ্টন হতে একবার ছুটি পেয়েছিল। পণ্টনে যোগ দেওয়ার পরে এটা ছিল তার প্রথম ছুটি। এই ছুটিতে নজরুল তার বাড়ীতে (আসানসোল মহকুমার অধীন জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে) গিয়েছিল। এই সময়ে সে কলকাতাও আসে এবং ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির আফিসে আমার সঙ্গে দেখা করে। এটা ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। নজরুলের সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,—তখনকার দিনে নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। শৈলজানন্দ সে-সময়ে আপার চীৎপুর রোডের কোথায় একটি মেসে থাকতেন এবং মহারাজা কাসিমবাজারের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শর্ট হ্যাণ্ড-টাইপ রাইটিং শিখতেন। তাঁর একখানা ছোট বইও তখন ছাপা হয়েছিল। আজকার সুধীমণ্ডলী হয়তো শৈলজানন্দের এ-বই সম্বন্ধে কিছু জানেন না! যাক, নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার কথাবার্তা স্থির হয়ে গেল যে তাদের পণ্টন ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সোজা কলকাতা এসে “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি”র আফিসে উঠবে। নজরুলের বয়স তখন ২২ বছরের মতো হবে, কিংবা কিঞ্চিৎ কমও হতে পারে। তখন তার মধ্যে আমি তিনটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম—সুগঠিত দেহ, অপরিমেয় স্বাস্থ্য ও প্রাণখোলা হাসি। নজরুলের এই তিনটি জিনিসের জন্মে প্রথম দেখাতেই লোকেরা তার ওপর আকৃষ্ট হতেন।

কলকাতায় আগমন

১৯২০ সালের শুরুর দিকে (কি মাস তা আমার মনে নেই) নজরুল-দেবের পণ্টন ভেঙে দেওয়া হলো। আগেকার কথা মতো নজরুল তার গাঁটরি-বোচকা নিয়ে সোজা ৩২, কলেজ ষ্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির আফিসে এসে উঠল। এখানে থাকার জায়গা ছিল। সাহিত্য সমিতির একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আফজালুল হক সাহেব থাকতেন। ৩, নম্বর কলেজ স্কোয়ারে (এখন নাম বক্সিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট) তাঁর দোকান ছিল, নাম ছিল মুসলিম পাবলিশিং হাউস। আমিও সাহিত্য সমিতির আফিসে আগে হ'তে থাকতাম। নজরুল যেদিন এসে পৌঁছাল সেদিন রাত্রেই আমাদের অনুরোধে সে গান গেয়ে আমাদের শোনাল। সে রবীন্দ্রনাথের গানই সাধারণত গাইত, কিন্তু সেদিন প্রথম গেয়েছিল সে একটি হিন্দুস্তানী গান —“পিয়া বিনা মোর জিয়া না মানে বদরী ছাইরে।” নজরুল যে খুব স্বকণ্ঠ গায়ক ছিল তা নয়, তবে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে সে গান গাইত। এই কারণে গায়ক হিসাবে খুব তাড়াতাড়ি সে জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম মেসগুলি হতে গান গাওয়ার জন্যে নজরুলের ডাক আসা শুরু হলো, অনেক বাঙালী হিন্দু পরিবারেও এই একই কারণে সে নিমন্ত্রিত হ'তে লাগল। নজরুল কারুর অনুরোধ উপেক্ষা করত না।

কোঁতুহলের বশে নজরুলের গাঁটরি-বোচকাগুলি আমরা খুলে দেখলাম। তাতে তার লেপ তোশক ও পোশাক পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি, ট্রাউজার্স ও কালো টুচু টুপি যা তখনকার দিনে করাচির লোকেরা পরতেন। তা ছাড়া ছিল একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (বাইনোকুলার), কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি, ইত্যাদি। পুস্তকগুলির মধ্যে ইরানের মহাকবি হাফিজের “দিওয়ান্”—এর একখানা

ভালো সংস্করণ (“দিওয়ান-ই-হাফিজ”) ছিল। এই কাব্যগ্রন্থে মূল পারসীর নীচে উর্দু তরজমাও দেওয়া ছিল। এই গ্রন্থ হতেই পরে “নূর লাইব্রেরী”র মালিক মঈনুদ্দীন হোসায়ন ও আমার অনুরোধে নজরুল হাফিজের সেই কবিতাটি যার প্রথম পংক্তি হচ্ছে—

“ইউসফ-ই গুম্গশ্ তা বাজ আইয়েদ ব-কিন্‌আন গম্ মখুর”-এর বাঙলায় তরজমা করেছিলেন। এই তরজমা—

“দুঃখ কি ভাই হারানো ইউসুফ্

কিনানে আবার আসিবে ফিরে”

মাসিক পত্রে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু তরজমাটি পুস্তকে ছাপা হয়নি। পুস্তকে ছাপানোর সময়ে তা হাফিজের ভাবালম্বনে পুনর্লিখিত হয়েছে।

কলকাতায় দু’দিন থাকার পরে নজরুল ইসলাম তার জিনিস-পত্র কলকাতায় রেখে দিয়ে চুরুলিয়া গ্রামে তার নিজের বাড়ীতে যায়। যতটা মনে পড়ে সে ৭৮ দিন সেখানে ছিল। সে-সময়ে কি একটা মান-অভিমানের ব্যাপার সেখানে ঘটেছিল। তারপরে সে আর কখনও তার বাড়ীতে যায় নি। (তবে, একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলার উপলক্ষে তাকে একবার ১৯৫৬ সালের জুন মাসে চুরুলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন নজরুল বোঝেই-নি যে সে চুরুলিয়ায় গিয়েছিল।)

চুরুলিয়া হ’তে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল ইসলাম বর্ধমানে নেমে গিয়ে সেখানকার ডিপ্লীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আফিসে সব-রেজিষ্ট্রারের চাকরির জন্তে একখানা দরখাস্ত দিয়ে আসে। যে-সব লেখা-পড়া জানা লোক পন্টনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নানান রকম চাকরিতে নিযুক্ত করা হচ্ছিল। আমরা দেখেছি নজরুলের চেয়ে কম লেখা-পড়া জানা লোক সব ডেপুটি কলেক্টরের চাকরি পেয়েছেন। নজরুল যখন পন্টনে যোগ দেয় তখন সে রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়ছিল। তখন তার একটা টেন্ট পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছিল।

সে ক্লাসের শুধু প্রথম ছাত্রই ছিল না, মেট্রিকুলেশন পড়া ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী লেখাপড়াও সে জানত। এই সব কারণে তার সব-রেজিষ্ট্রারের চাকরি হওয়া খুবই সম্ভব ব্যাপার ছিল। কলকাতায় আমাদের আফিসের ঠিকানায় এই চাকুরির জন্তে মূল্যাকত (Interview) করার পত্রও নজরুলের নামে এসে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা সকলে মিলে তাকে মূল্যাকত করতে যেতে দিইনি। আমরা তাকে বুঝিয়েছিলাম যে সব-রেজিষ্ট্রারের চাকরি হ'লে কোথায় কোন গ্রামে তাকে পড়ে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। তাতে তার সাহিত্যিক প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকের ধারণা যে নজরুলের নামে চাকুরির নিয়োগ পত্র এসে গিয়েছিল এবং সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। একথা ঠিক নয়।

হাঁ, নজরুল তো এসে “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি”র আফিসে উঠল, কিন্তু তারপরে আমাদের কি অবস্থা হলো তা এখনও বলিনি। ধরতে গেলে একরকম আক্রমণই শুরু হয়ে গেল আমাদের ওই বাড়ীটির ওপরে। বহুল সংখ্যায় বাঙালী পণ্টনের সৈনিকেরা সে-বাড়ীতে আসছিলেন ও চলে যাচ্ছিলেন। আমরা সাহিত্য সমিতির লোকেরা বসবার-দাঁড়বার স্থান পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। তখন ওই সৈনিকদের মুখে শুনেছিলাম যে বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সাত হাজার সৈনিকের প্রত্যেকেই পণ্টনের দু'জন সৈনিককে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম এবং অপর জন জমাদার শম্ভু রায়। জমাদার রায় কুষ্টিয়ার লেখক শ্রীকিরণ রায়ের দাদা ছিলেন। এখন তিনি কোথায় আছেন তা জানিনে, তখন তিনি সব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। চাকরি গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত তিনি ৩২, কলেজ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে হামিশা যাতায়াত করতেন। জমাদার রায় সম্ভবত বি-এস-সি পড়ার সময়ে পণ্টনে যোগ দিয়েছিলেন।

আর একটি কথার এখানে উল্লেখ করব। নজরুল যখন কলকাতায়

এলো তখন নূর লাইব্রেরীর মালিক মঈনউদ্দীন হোসায়ন সাহেব তাঁর দেশের বাড়ীতে (মাড়গ্রাম, বীরভূম) ছিলেন। আমি তাঁকে লিখে জানালাম যে নজরুল ইসলাম কলকাতায় এসেছেন। লেখার উদ্দেশ্য তিনি বুঝলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রেজিষ্ট্রী খামে পুরে ৩৫টি টাকা তিনি আমায় পাঠিয়ে দিলেন। নিশ্চয় তিনি আশা পোষণ ক'রেছিলেন যে নজরুলের কোনো না কোনো লেখা তিনি ছাপবেন। যে-আশাই তিনি মনে পোষণ করুন না কেন, ওই সময়ের ওই সাহায্য আমাদের নিকটে খুবই মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল। তার আগে কেউ এত টাকা নজরুলকে দেননি।

”মোস্লেম ভারত”

আগেই বলেছি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসের একখানা ঘর ভাড়া ক’রে আফ্জালুল হক সাহেব থাকতেন। তিনি তাঁর মুসলিম পাবলিশিং হাউস হ’তে একখানা বাঙলা মাসিক কাগজ বা’র করার তোড়জোড় বেশ কিছুদিন ধ’রে করছিলেন। আমরা একত্রে থাকতেম ব’লে এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হ’ত। আমি তাঁর কাগজের নাম হ’তে ‘মোস্লেম’ কথাটা বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে আমাদের সাহিত্য সমিতির নামের সঙ্গে ‘মুসলমান’ কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর পাবলিশিং হাউসের নামের সঙ্গেও “মোস্লেম” কথাটা আছে, এখন তিনি তাঁর কাগজের নামের সঙ্গেও ‘মোস্লেম’ কথা যোগ করতে যাচ্ছেন। এই ভাবে আলাদা হয়ে থাকার মনোবৃত্তি প্রকাশ পাচ্ছে না কি? আফ্জালুল হক সাহেব সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন লোক ছিলেন না। সুসাহিত্যিক ও কবি মোজাম্মেল হক সাহেব (শান্তিপুরের) ছিলেন তাঁর পিতা। হিন্দুদের মধ্যে তাঁর বন্ধুত্ব ও পরিচয় ব্যাপক ছিল। তবুও ব্যবসায়ের দিক থেকে তাঁর কাগজের নাম হ’তে ‘মোস্লেম’ কথাটি বাদ দিতে তিনি সাহস পেলেন না। মুসলিম সম্পাদিত কাগজ যে হিন্দুরা বেশী কিনবেন এ-ভরোসা তাঁর ছিল না।

করাচি হতে কাজী নজরুল ইসলাম যে-দিন কলকাতায় এসে পৌঁছাল সে-দিনই “মোসলেম ভারতে” লেখা দেওয়া সম্পর্কে আফ্জালুল হক সাহেবের সঙ্গে তার কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলো। প্রথম সংখ্যার কপি তখন প্রেসে যাচ্ছিল। নজরুলের পত্রোপন্যাসের ক’খানা পত্র তার করাচি থাকা কালেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। সে-উপন্যাসখানা ক্রমশ “মোস্লেম ভারতে” প্রকাশ করার ইচ্ছা সে প্রকাশ করল। আফ্জাল সাহেব তখনই রাজি হলেন। উপন্যাসখানার নাম তখনও স্থির হয়নি।

নজরুল বলল, “তহ্মিনা” কিংবা “বাঁধন-হারা” নাম দিতে পারেন। আমরা সকলে “বাঁধন-হারা” নামটি পসন্দ করলুম। এই নামেই পাণ্ডুলিপি প্রেসে গেল। পরে এই “বাঁধন-হারা” নামটি নজরুলের নামের সঙ্গে এঁটে গিয়েছিল। তার কবিখ্যাতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে নজরুলকে সৈনিক কবি কিংবা বাঁধন-হারা কবি নামে অভিহিত করতে লাগলেন। নজরুল নিজে সৈনিক নামে অভিহিত হ’তে ভালোবাসত। তবে “বাঁধন-হারা” নামটি তার গায়ে বেশী ক’রে এঁটে গিয়েছিল। নজরুলের “বিদ্রোহী” কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর হতে লোকেরা তার নাম দিলেন “বিদ্রোহী কবি”। “বাঁধন-হারা” উপন্যাস হলেও আসলে তা গল্প কাব্য। তার রচনা-রীতি নজরুলের সম্পূর্ণ নিজস্ব। একজন বাইশ বছরের ছেলের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা ছিল না।

নজরুলের কবিখ্যাতি লাভের প্রধান সহায়ক হয়েছিল “মোস্লেম ভারত”। শান্তিপুরের সাহিত্যিক ও কবি মোজাম্মেল হক সাহেব নামে এ-কাগজের সম্পাদক ছিলেন। আসলে এর সব কিছুই করতেন তার ছেলে আফ্জালুল হক সাহেব। কাগজখানার বিস্তারিত অফিস ৩, নম্বর কলেজ স্কোয়ারে ছিল। কিন্তু তার অবিস্তারিত সম্পাদকীয় অফিস ছিল ৩২, নম্বর কলেজ স্কোয়ারের বাড়ীতে আফ্জাল সাহেবের তত্ত্বপোশ। এই বাড়ীটি আগে হতেই একটি সাহিত্যিক আড্ডা ছিল। নজরুল আসার পর হতে এবং কার্যত “মোস্লেম ভারতের” সম্পাদকীয় অফিস এ বাড়ীতে হওয়ায় আড্ডাটি বড় বেশী জমজমাট হয়ে উঠল। মুসলিম লেখকদের মধ্যে এ-আড্ডায় আসতেন না এমন লোক কম ছিলেন। কাজী আবদুল ওহুদ তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি তো প্রতি দিনই আসতেন। কবি গোলাম মুস্তাফা পরে আসা কমিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু লেখকদের মধ্যে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তো আসতেনই, আরও আসতেন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়, শ্রীপ্রেমানুর আতর্ষী, কবি শ্রীকান্তি ঘোষ এবং আরও অনেকে।

পরিচয় হওয়ার পর হতে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তো প্রতিদিনই আসতেন। তা ছাড়া, রাজনীতি ঘাঁদের পেশা ছিল তাঁরাও আসতেন! নজরুল তো শুধু কবি ও লেখক ছিল না, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিকও সে ছিল। পন্টনে যোগ দিয়ে অনেকে উদাম-উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। নজরুল তা হয়নি। সে যখন পন্টন হ'তে ফিরে এল তখন সে ছিল দেশপ্রেমে ভরপুর ও স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। এটা কোনো কোনো সাহিত্যিক বুঝতে পারতেন না বলে কিঞ্চিৎ তিক্ততাও মাঝে মাঝে সৃষ্টি হতো।

নজরুলের কবিতা এবং তার গল্প লেখাও নানান কাগজে ছাপা হ'তে লাগল। কিন্তু “মোস্লেম ভারতে”র প্রতি সংখ্যায় তার কিছু লেখা ছাপা হচ্ছিল। “বাঁধন-হারা” তো তাতে ছাপা হচ্ছিলই, তা ছাড়া তাতে ছাপা হলো “মোহররম”, “কোরবানী”, “শাতিল আরব” ও “খেয়া-পারের তরঙ্গী”, প্রভৃতি।



সাক্ষ্য দৈনিক “ববয়ুগ”

আগেই বলেছি, কাব্য ও সাহিত্য জগতে নজরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এটা ছিল আমার একান্ত কামনা। কিন্তু তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়েও আমার আলোচনা হ'তো। ১৯১৭ সাল হ'তে দেশে নানান রকম আন্দোলন মাথা তুলেছিল। ১৯২০ সালে তো দেশ টগবগ ক'রে ফুটছিল। তার কারণ ১৯১৯ সালের “ভারত সংস্কার আইন” দেশ কিছূতেই মেনে নেবে না। পর্বত ও সমুদ্রের বাধা সত্ত্বেও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রভাব আমাদের দেশের মজুরদের ওপরেও পড়েছিল। তাঁরাও সংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছিলেন আগে হ'তেই। নজরুল আর আমি তখন পরামর্শ করতে লাগলেম কি ক'রে একখানা ছোট্ট দৈনিক কাগজ বার করা যায়। এই পরামর্শে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী সাহেব (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নন) ও ফজলুল হক সেলবর্সী। মঈন-উদ্দীন হোসায়ন সাহেবও খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন। কিন্তু টাকা কোথায়? প্রথম মহাযুদ্ধের পরের কথা। এক দিক থেকে দেশে যেমন জোর রাজনীতিক আন্দোলন চলছিল, অন্য দিক থেকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী গঠন ক'রে বড় ব্যবসায়ী হওয়ার চেষ্টাও বিস্তর লোক করছিলেন। এইরূপ একটি কোম্পানী গঠন ক'রে টাকা তুলে দৈনিক কাগজ বা'র করা যায় কিনা তারই পরামর্শ করার জন্মে আমরা সকলে মিলে একদিন মিল্টার এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন হাইকোর্টের নামজাদা উকীল (এখনকার ভাষায় এডভোকেট)। কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনের একজন বড় নেতাও তিনি ছিলেন। তাঁর নিকটে প্রস্তাব করতেই তিনি বললেন একখানা দৈনিক কাগজ বা'র করার ইচ্ছা তাঁর অনেক দিনের। আমরা যদি কাগজ চালাবার সাহস করতে পারি তবে তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দিবেন। আমরা তখনই রাজি হলাম।

২৬/৭

২৭/৩/৭

ফজলুল হক সাহেবের একটি ছাপাখানা ছিল, কিন্তু তাতে বাঙলা টাইপ ছিল না। টাইপ ইত্যাদি কিনে প্রেসটিকে চালাবার মতো করা হলো। ঠিক হলো রয়াল (২০ ইঞ্চি x ২৬ ইঞ্চি) সাইজের এক তা কাগজের একখানা সান্ধ্য দৈনিক বার করা হবে, দাম হবে এক পয়সা। প্রথমে নাম নিয়ে গোলমাল বাধল। ফজলুল হক সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দুরা কাগজ কিনবেন না। কাগজের নামটি আরবী কিংবা পারসী শব্দের হ'লে মুসলমানরা বেশী কিনবেন। আমরা তাঁকে অনেক ক'রে বোঝানোর ফলে কাগজের নাম “নবযুগ” রাখা স্থির হলো। আফজালুল হক সাহেবকে যা বোঝাতে পারা যায়নি ফজলুল হক সাহেবকে তা বোঝাতে পারায় আমরা মনে মনে খুবই খুশী হলেম। এক হাজার টাকা জমা দিয়ে “নবযুগ”-এর ডিক্লারেশন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হতে পাওয়া গেল। কাগজ বার হওয়ার দিন ঘনিয়ে যখন এলো তখন মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী সাহেবের এমন একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘটল যে তাঁর পক্ষে আর “নবযুগ”-এ কাজ করতে আসা সম্ভব হলো না। ফজলুল হক সেলবর্সী, নজরুল ইসলাম ও আমি থাকলাম। মঈনুদ্দীন হোসায়ন সাহেব কিছু কিছু সাহায্য করবেন স্থির হলো।

মিন্টার এ, কে. ফজলুল হক সাহেব নিজে বাঙলা লিখতে পারতেন না। তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে আমরা মুসলমানের ছেলেরা হয়তো ভালো বাঙলা লিখতে পারব না। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে শুরুতে কিছুদিন শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু টাকা দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়ে নেওয়া হোক। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর নীতির কোনও বালাই ছিল না। টাকা দিলে তাঁকে দিয়ে যা খুশী তা লিখিয়ে নেওয়া চলত। আমরা শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে লেখানোর প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হলাম না। শেষ পর্যন্ত নজরুল ইসলাম ও আমার যুগ্ম-সম্পাদনায় “নবযুগ” একদিন বা'র হলো। হিন্দু-মুসলমান সকলেই কাগজখানা

24.5.94
8393



কিনতে লাগলেন। আমরা চাহিদা মেটাতে পারতেন না। কারণ ফজলুল হক সাহেবের ছাপাখানার মেশিনটি ছিল খোঁড়া।

কাগজের লেখার তারিফ ক'রে ফজলুল হক সাহেবের অনেক হিন্দু বন্ধু তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। কলকাতা হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজ (নাম যদি ভুলে না গিয়ে থাকি মিস্টার জষ্টিস্ টিউনান) বাঙলা জানতেন ও পড়তেন। তিনি ফজলুল হক সাহেবকে চেয়ারে ডেকে নিয়ে বললেন, “তুমি তো কাগজের মারফতে অগ্নিবর্ষণ শুরু করে দিয়েছ।” এই সবার পরে তাঁর মনে ভরোসা হলো যে আমাদের ওপরে কাগজ লেখার ভার দিয়ে তেমন কিছু খারাব কাজ করা হয়নি।

একথা মানতেই হবে যে নজরুলের জোরালো লেখার গুণেই “নবযুগ” জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু জোরালো লেখার বললে সব কিছু বলা হলো না, নজরুলের লেখা ছেড়িগুণি হতো অতুলনীয়। রয়াল সাইজের কাগজে কতটুকুই বা স্থান। তাই নজরুল সফলতার সহিত বড় বড় খবর-গুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত খবরে পরিণত করত। আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই কী করে নজরুল আয়ত্ত করেছিল এই ক্ষমতা! তার আগে তো সে কোনোদিন কোনো দৈনিক কাগজের আফিসেও প্রবেশ করেনি।

“নবযুগ” এর কাজে যোগ দেওয়ার পরে আমি আর “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি”র সব সময়ের কর্মী থাকলাম না। এই অবস্থায় সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে থাকা আমাদের নিকট সমীচীন মনে হলো না। নজরুল আর আমি প্রথমে মার্কুইস লেনের একটি বাড়ীর দোতলার একখানা ঘরে উঠে গেলাম। এই বাড়ীটি বাইরের বন্ধুদের নিকট জানাজানি হয়নি। কারণ, আমরা বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সাহিত্য সমিতির আফিসেই করতাম। এর পরে আমরা ৮-এ, টার্নার স্ট্রীটে উঠে যাই। এটি ছিল বস্তীর ভিতরে একটি ছোট্ট একতলা পাকা বাড়ী। এর আশে-পাশে সবই ছিল খোলার বাড়ী। গরীব মুসলমানেরা এইসব খোলার বাড়ীতে থাকতেন। নজরুল তো বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে খালা (মাসী)

পাতিয়ে নিল। বাঁর গায়ের রং খুব ফরসা ছিল তাঁকে সে রাঙা খালা ডাকত। খালারা কোনো কোনো দিন তাঁদের রান্না করা তরকারি আমাদের দিয়ে যেতেন। আমাদের বাড়ীর মেজেটি গলি থেকে নিচু হয়ে গিয়েছিল। তবুও আমরা যে একটি পুরো বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলাম এটা ছিল আমাদের নিকটে বড় সান্ত্বনা।

৮-এ, টার্নার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আমরা এই জন্ম উঠে গিয়েছিলাম যে “নবযুগ”-এর ছাপাখানা ও অফিস টার্নার ষ্ট্রীটে ছিল। ২২, টার্নার ষ্ট্রীটে ছিল “নবযুগ”-এর ছাপাখানা, আর ৬, টার্নার ষ্ট্রীটের নীচের তালার দু’খানা-ঘর ছিল “নবযুগ” এর অফিস। এই বাড়ীতে ফজলুল হক সাহেব থাকতেন। আমাদের ৮-এ, টার্নার ষ্ট্রীট হ’তে ৬, টার্নার ষ্ট্রীট এক মিনিটের পথও ছিল না। টার্নার ষ্ট্রীটের নাম আগে তাম্বুলি লেন ছিল। এর কয়েকটি বাড়ীতে ইউরোপীয় বেশাড়া থাকত। তাদের এই রাস্তা থেকে তুলে দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশন রাস্তাটির নাম বদলে টার্নার ষ্ট্রীট করে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল বেশাড়র গন্ধ ধুয়ে-মুছে দেওয়া। এখন এই রাস্তার নাম নওয়াব আবদুর রহমান ষ্ট্রীট। নওয়াব আবদুর রহমান কলকাতা ছোট আদালতের বড় জজ ছিলেন। তিনি নওয়াব আবদুল লতীফের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁদের আদি বাস ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়।

৮-এ, টার্নার ষ্ট্রীটের বাড়ীটির কথা আমায় বারে বারে উল্লেখ করতে হচ্ছে। অন্ধকার বস্তীর ভিতরে হওয়া সত্ত্বেও এই বাড়ীতে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক ব্যক্তির আসতেন। নেবুতলার ওখানে একটি হাই-স্কুলে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার হেডমাস্টার ছিলেন। তিনি স্কুল ছুটির পরে প্রতিদিনই আসতেন। এই বাড়ীটি সত্যিই স্মরণীয়। “নবযুগ”-এর কংজের প্রচণ্ড চাপের ভিতর দিয়েও এই বাড়ীতে বসেই নজরুল তাঁর প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি রচনা করেছে। আফজালুল হক সাহেব ঢাকা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি খান বাহাদুর মুহম্মদ

আজমের স্ত্রীর (দুর্ভাগ্য যে বেগম সাহেবার নাম ভুলে গেছি) ঝাঁকা একখানা নৌকার ছবি নিয়ে আসেন। “মোস্লেম ভারতে” ছাপানোর আগে কিঞ্চিৎ পরিচয় লিখে দেওয়ার জন্তে আফ্জাল সাহেব ছবিখানা নজরুলের নিকটে রেখে যান। নজরুল এই ছবির ওপরেই লিখে ফেলল তার বিখ্যাত কবিতা “খেয়া পারের তরনী” এই ৮-এ, টার্নার প্টেটের বাড়ীতে বসেই। এই বাড়ীর নম্বর আমার ভালো ক’রে মনে পড়ছিল না। বাড়ীটি তখনই খুব পুরানো ছিল। আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল যে ৩৮ বছর পরে বাড়ীটির অস্তিত্বই হয় তো নেই। তাই এই লেখা তৈয়ার করার সময়ে আমি কমরেড আবদুল হালীমকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীটি দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম বাড়ীটি তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। এখন পূর্ব বঙ্গের লোকেরা তাতে থাকেন, অন্তত যে-মেয়েটির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম সে পূর্ব বঙ্গের মেয়ে ছিল।

নজরুল ইসলাম নিছক কবি ও সাহিত্যিক ছিল না। সে যে রাজনীতিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিকও ছিল একথা তার কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধু বুঝতে চাইতেন না। তাঁদের মধ্যে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমি অবশ্য পরে লিখব। এই সাহিত্যিক বন্ধুদের এটা লক্ষ করা উচিত ছিল যে কেন “নবযুগ”-এ কাজ করার সময়ে নজরুলের কবি প্রতিভা এমন আশ্চর্যরূপে বিকশিত হয়েছিল। এখানে দুই নজরুলের সর্মগ্ধ ঘটেছিল,—কবিরূপী নজরুলের ও স্বাধীনতার সৈনিক নজরুলের। তাই নজরুল এই সময়ে কবিতার এমন বিচিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যে-সৃষ্টি তার অভিনবত্বে সমস্ত দেশকে চমকে দিল। বাঙলা দেশে নজরুলের মতো ভাগ্যবান কবি বোধ হয় আর কেউ জন্মাননি। মাসিক পত্রে মাত্র কয়েকটি কবিতা ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলের কবি খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। সে এক রকম রাতারাতিই বাঙলার খ্যাতিমান কবিদের সঙ্গে আসন পেয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত, তাঁর প্রতিভা দিকে দিকে বিকীর্ণ। নজরুলের কণ্ঠে তখন গীত হচ্ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত। প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে তখন পরিচিত হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে একত্রে গানও গাইছে। সে মুখে আনুভূতি করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। এমন কি রবীন্দ্র কবিতার প্যারোডি ক'রে সে “নবযুগ”-এর হেডিং পর্যন্ত দিচ্ছে। যেমন—

“আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরান সখা কৈশুর হে আমার।”

কৈশুর ইরাকের রাজা ছিলেন। এই নজরুল, এই বাইশ বছরের যুবক হঠাৎ কিনা রচনা করল এমন সব কবিতা যে-সব সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত, যে-সব সম্পূর্ণরূপে তার একান্ত নিজস্ব। তাই তো সে রাতারাতি কবি প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারল।

একটা যুগোচিত রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নজরুল আর আমি “নবযুগ”-এ কাজ করতে গিয়েছিলাম। গোড়ায় আমরা মালিক মিস্টার এ. কে. ফজলুল হকের নিকট হতে কোনো বাধাও পাইনি। আমরা যেমন বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার চেষ্টা করছিলাম তেমনই আমরা “নবযুগ”-এ তুলে ধরছিলাম মজুর-কৃষকের দাবীও। সরকার ছ' একবার সাবধানী ঘণ্টা বাজাল, তারপরে “নবযুগ”-এর জামিনের এক হাজার টাকা বাজেয়াফৎ ক'রে নিল। আমরা ছ' হাজার টাকা জমা দিয়ে আবারও কাগজ বা'র করলাম। কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হ'তে লাগল। তিনি স্থিরমতির লোক নন। তিনি স্থির করতে পারছিলেন না রাজনীতির কোন পথ ধ'রে তিনি চলবেন। এই সময়ে যতটা এই কারণে নয়, তার চেয়েও বেশী তার সাহিত্যিক বন্ধুদের চাপে নজরুল “নবযুগ”-এর

কাজ ছেড়ে দিয়ে দেওঘরে চ'লে গেল। যাওয়ার সময়ে যে-গানটি রচনা ক'রে সে গেয়ে গেলো তার শুরু হচ্ছে :—

“বন্ধু আমার ! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন পুরে

ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে ?

আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,

ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে ॥”

নজরুল যখন গানটি গাইছিল তখন কবি মোহিতলাল মজুমদার আনন্দে প্রায় গ'লে পড়ছিলেন। তিনি বারে বারে নজরুলের চিবুক স্পর্শ করছিলেন। কথা হয়েছিল নজরুল দেওঘরে থেকে “মোস্লেম ভারতে”র জন্মে লিখবে এবং আফ্জালুল হক সাহেব মাসে মাসে নজরুলকে খরচের জন্মে এক'শ টাকা হিসাবে পাঠাবেন। আমি জানতাম হাজার সদিচ্ছা সত্ত্বেও মাসে মাসে এক'শ টাকা হিসাবে আফ্জল সাহেব কিছুতেই জোগাতে পারবেন না। তারপরে, অনেক উত্তাপ সৃষ্টি না হ'লে নজরুলের কলম থেকে ভালো লেখা বা'র হয় না। কিন্তু দেওঘরে সে উত্তাপ কোথায় ? আমার ধারণা দু'দিক থেকেই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। কিছুকাল পরে এক ছাত্র বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আমি দেওঘরে যাই। সেই জীবনে একবার মাত্র আমি দেওঘরে গিয়েছিলাম। নজরুলকে জিজ্ঞাসা না করেও বুঝলাম অবস্থা স্তব্ধতার নয়। লেখার দিক থেকেও সে বিশেষ এগোতে পারেনি। দু'চারটি গান ও কবিতা সে লিখেছে মাত্র। তার মধ্যে একটি হচ্ছে “আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলত নিতুই সকাল-সাঁজে।” ছাত্র বন্ধুটির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আমি তাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

“নবযুগ”—এ আমি শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলাম। কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের মতিগতি আমার কিছুতেই ভালো লাগছিল না। বর্ধমানের

আবুল কাসেম সাহেব তাঁকে তখন জোঁকের মতো কামড়ে ধরেছেন। তিনি ফজলুল হক সাহেবের কলেজের সহপাঠী ছিলেন। যে-সময়ে কাসেম সাহেব বি. এ. পাস করেছিলেন সে-সময়ের মুসলমানরা বি. এ. পাস করে ভালো ভালো চাকরী পেয়েছেন। তা ছাড়া, তিনি বড় চাকুরে পরিবারের লোক ছিলেন। কিন্তু চাকরি তিনি নেন নি। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তাঁদের একজন ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকারীরূপে “বেঙ্গলী” কাগজেও তিনি কাজ করেছেন। তবে ১৯২০ সালের কাসেম সাহেব সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক ছিলেন। তাঁর রাজনীতিতে তখন বড় বেশী পচন ধরে গেছে। আমি দেখলাম ফজলুল হক সাহেবের আর মুক্তি নেই। তাই, আমিও “নবযুগ” ছেড়ে দিলাম। আমার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজও বন্ধ হয়ে গেল।

হ্যাঁ, ফজলুল হক সেলবার্সি বহু আগে “নবযুগ” ছেড়েছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্র হ’তে তাঁরও পতন ঘটেছে। আমি তাঁকে শেষ দেখেছিলাম মীরাটের আদালতে। তিনি ভারত সরকারের পক্ষ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন।

আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ও নজরুলের তথাকথিত প্রথম বিবাহ

১৯২১ সালের কথা। নজরুল ইসলামের সঙ্গে একটি মুসলিম মেয়ের অকদ্ (বিয়ের চুক্তি) হয়েছিল এবং পরক্ষণেই সে-বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। আরও পরিষ্কার ভাষায় বললে স্বামী-স্ত্রী কখনও একত্রে বাস করেননি। অ-মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেন না যে মুসলমানদের বিয়েটা হচ্ছে ক'জন সাক্ষীর সামনে স্বামী-স্ত্রীর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। এখন যে সিবিল ম্যারেজ হয় ঠিক তারই মতো। মুসলিম বিয়েতে স্বামীরাই হচ্ছেন প্রবল পক্ষ, তাঁরা যখন খুশী বিয়ে নাকচ করে দিতে পারেন। স্ত্রীরাও বিয়ে বাতিল করতে পারেন, কিন্তু তার জগ্গে তাঁদের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। সব অবস্থাতেই স্ত্রীরা অবশ্য একটা মোহরানা (স্ত্রী-ধন) পাওয়ার অধিকারিণী হন।

নজরুলের এই তথাকথিত বিয়েটা তার জীবনের একটি বড় দুঃখজনক ঘটনা। এই সম্বন্ধে কিছু না বলেও নজরুলের জীবনী রচনা করা চলে। আগে যাঁরা আমার নিকটে নজরুল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছেন তাঁদের আমি এই বিয়ের কথা কিছু বলিনি। কিন্তু এখন অবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। আজকাল যাঁরাই নজরুল সম্বন্ধে লিখছেন তাঁরা এই বিয়ের কথাও লিখছেন, অনেকে যা সত্য নয় তাও লিখছেন। হালে আমার নিকটে যাঁরা নজরুল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আসছেন তাঁরা তরুণ। এই বিয়ের সম্পর্কে তাঁরাও আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। অনেকের মনেই যখন এ-সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে তখন সমস্ত ব্যাপার আমায় বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে।

১৩১৩ সালে আমি নোয়াখালী জিলা স্কুল হতে ঢাকা কেন্দ্রে
 মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। সেই সময় আলী
 আকবর খানের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি ঢাকা
 কলেজে পড়তেন, বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। দু'একদিন
 মাত্র দেখা হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে আমার মনে আটকে থাকলেন তার
 কারণ ছিল। তখন আলী আকবর খান ইউরোপীয় পোশাক
 পড়তেন এবং ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলতেন না। তার অনেক বছর
 পরে (১৯১৮ সালে) তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় কলকাতায়
 ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের টেলর হোফেলে বদিউর রহমান সাহেবের ঘরে।
 বদিউর রহমান সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন। অবিভক্ত বাঙলায় তিনি
 শিক্ষা বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ডিরেকটরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।
 দেশ ভাগ হওয়ার পরে পাকিস্তানে চলে যান। তাঁর সঙ্গে
 আলী আকবর খানের পরিচয় হয়েছিল ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া ফোর্সের
 ট্রেনিং ক্যাম্পে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই ফৌজটি গঠিত হয়েছিল।
 সৈনিকদের মোটামুটি একটা শিক্ষা দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া
 হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল যে দরকার পড়লেই তাঁদের যুদ্ধে ঢেকে
 নেওয়া হবে! যা'ক, দ্বিতীয়বার যখন আমার সঙ্গে আলী আকবর
 খানের দেখা হলো তখন দেখলাম তিনি ধুতি শাট' প'রে আছেন
 এবং কথাও বলছেন বাঙলায়। আমার উপলক্ষে তিনি ঘন ঘন
 বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে আসতে লাগলেন, আর
 ক্রমে ক্রমে ওখানকার আর সকলের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হয়ে
 গেলেন। কি করেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, তিনি যাদব চক্রবর্তীর
 (বিখ্যাত পাটীগণিত প্রণেতা) পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ের ম্যানেজার।
 পরে আমরা জেনেছিলাম যে তিনি ওখানকার ম্যানেজার ইত্যাদি কিছুই
 নন! তাঁর এক বন্ধু শ্রীউমেশ চক্রবর্তী ওখানে চাকুরি করতেন। সেই
 উপলক্ষেই তিনি যাদব চক্রবর্তীর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। তিনি

বিভিন্ন জিলার ছোট ছোট ভৌগলিক বিবরণ লিখে প্রকাশ করতেন। তাঁর বড় ভাই আলতাফ আলী খান প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ক্যানভাস করে বিভিন্ন স্কুলে এসব বই বিক্রয় করতেন। শিক্ষা বিভাগের পাঠ্য করা বই না হলেও ক্যানভাসিং-এর জোরে বইগুলি বিক্রয় হয়ে যেতো।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসের সঙ্গে আলী আকবর খানের ঘনিষ্ঠতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিন আমরা সকলে দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে তিনি সমিতির একখানা ছোট ঘরে তাঁর বিছানা পেতে নিয়েছেন। চক্ষু লজ্জার খাতিরে আমরা তাঁকে চ'লে যেতে বলতে পারলাম না। এর মধ্যে তিনি একটা খারাব রোগেও আক্রান্ত হলেন। আমার মন বিরক্তিতে ভ'রে গেল। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে তখন আমার মনে ঔদার্যের কিছু অভাব ছিল। ঠিক এই সময়ে নজরুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে থাকতে এলো। তার সঙ্গে আলী আকবর খানের পরিচয় তো হলোই, সে খান সাহেবের অস্থখে কিঞ্চিৎ সেবাও করল। তিনি বাহত ভালো হয়ে উঠলেন।

তারপরে দেখা গেল যে ভৌগলিক বিবরণের বই লেখা ছেড়ে দিয়ে আলী আকবর খান প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে অন্য বই লেখা শুরু করে দিয়েছেন। এই রকম একটি বইয়ের জন্যে নজরুল ইসলাম ছোটদের প্রিয় “লিচু চোর” কবিতাটি লিখে দিয়েছিল। আমার ঠিক মনে নেই নজরুলের আরও কি কি কবিতা আলী আকবর খানের জন্যে লেখা হয়েছিল। মোটের ওপরে সেই থেকে তিনি নজরুলকে জোর খোশামদ করতে লাগলেন। প্রাইমারী স্কুলের বই লিখে ও ছাপিয়ে তাঁর বড়লোক হওয়ার (শুনেছি পরে তিনি তাই হয়েছিলেন) উদ্দেশ্য ছিল। নজরুলকে দিয়ে “লিচু চোর” এর মতো কবিতা ইত্যাদি মাঝে মাঝে

লিখিয়ে নিতে পারলে তাঁর ব্যবসায়ের পোয়াবারো হবে এটা তিনি ভালোরূপে বুঝতে পেরেছিলেন।

দেওঘর হতে ফেরার পরে নজরুল সাহিত্য সমিতির আফিসে আফজাজুল হক সাহেবের সঙ্গে থাকছিল। এই সময়ে আলী আকবর খান তাকে ধরে বসলেন—“চলুন কাজী সাহেব, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে”। তার মানে ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লা মহকুমার অধীন দৌলতপুর গ্রামে। নজরুল আমার মত জানতে চেয়েছিল, সে যাবে কনা। আমি তাকে যেতে বারণ করেছিলাম এই জগ্গে যে আলী আকবর খান অকারণে অসত্য কথা বলতেন। তার ওপরে তাঁর স্বভাবে বড় নাটুকে ভাব ছিল। তিনি কখনও অভিনয় করতেন কিনা আমার জানা নেই, তবে সম্রাট বাবরের জীবনের ওপরে তিনি তখন একখানা নাটক লিখছিলেন। শেষ পর্যন্ত নজরুল একদিন আমাকে না বলেই আলী আকবর খানের সঙ্গে চলে গেলো। আমি তখন আলাদা জায়গায় থাকতাম।

যাওয়ার পথে আলী আকবর খান নজরুলকে নিয়ে কয়েকদিন কুমিল্লায় কান্দির পারে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় থেকে গেলেন। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন কুমিল্লা জিলা স্কুলে আলী আকবর খানের সহপাঠী ছিলেন। সেই সূত্রে এই বাসায় তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনি শ্রীবীরেন সেনের মা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীকে মা ডাকতেন। এই পরিবারে শ্রীবীরেন সেনের মা বাবা ছাড়া ছিল তাঁর দু’টি ছোট বোন বাচ্চি আর জটু। তাদের দু’জনের ভালো নাম আর এখনকার নাম যথাক্রমে কমলা দাশগুপ্তা ও অঞ্জলি সেন। আরও ছিলেন বীরেন সেনের বিধবা জেঠীমা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী ও তাঁর মেয়ে (একমাত্র সন্তান) প্রমীলা, ডাক নাম তুলি। এই বাসায় বীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীও ছিলেন, আর ছিল তাঁর ছোট্ট ছেলে রাখাল। এই পরিবারটি

দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু তাতে একটি সুস্থ সাহিত্যিক আবহাওয়া সব সময়ে বিরাজ করত। প্রমীলা, বাচ্চি, এমন কি ছোট্ট জটুও রবীন্দ্র সঙ্গীতে বাসা মুখরিত করে রাখত। কাজেই নজরুলকে তাঁরা যে সাদরে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এই বাড়ীর আদর যত্নে ও সাহিত্য-সঙ্গীতের আবহাওয়ায় নজরুল সত্যি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিরজাসুন্দরী দেবীকে সেও মা বলে ডাকতে লাগল এবং তিনিও তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন।

ক'দিন কুমিল্লা থাকার পরে নজরুল দৌলতপুর গ্রামে আলী আকবর খানদের বাড়ীতে চ'লে গেল। এ বাড়ীতেও তার অনেক আদর-আপ্যায়ন হ'তে লাগল। আলী আকবর খানের এক বিধবা বড় বোন (দিদি) তাঁদের পরিবারের কতৃৎস্বরূপা ছিলেন। তিনিও নজরুলকে মায়ের মত স্নেহ করতে লাগলেন। খান সাহেবদের পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল, পরিবারে চাকর-বাকরও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তাঁদের দাস-দাসী ছিল না। পুরানো অভিজাত মুসলিম পরিবারেই শুধু তখনও হয়তো দাস-দাসী (গোলাম-বাঁদী) ছিল। কিন্তু আলী আকবর খানদের সেই ধরনের পরিবার ছিল না। বেগম সামসুন্নাহার মাহমুদ লিখেছেন ওই বাড়ীর দাস-দাসীর ব্যবহারে নজরুল মনে আঘাত পেয়েছিল। এ কথা ঠিক নয়।

আলী আকবর খানের আর এক বড় বোনের বিয়ে তাঁদের পাড়ার এক বাড়ীতে হয়েছিল। তিনিও বিধবা ছিলেন। তাঁর এক ছেলে জাহাজী ছিলেন, আর এক মেয়ে ছিলেন বিবাহযোগ্য। আরও ছেলে ও মেয়ে তাঁর ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। এই পরিবারটি বড় দরিদ্র ছিল। সেই জগ্নে আলী আকবর খানরা তাঁদের তেমন খোঁজ-খবর নিতেন না।

নজরুলের যাওয়ায় উপলক্ষ ক'রে আলী আকবর খানের এই বড় বোনেরাও তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত করতে থাকেন। সত্যি নজরুলের

লোক আকর্ষণ করার অসাধারণ শক্তি ছিল। এই সূত্রে বিবাহযোগ্য মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। তিনি নাকি নজরুলের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আফতাবুদ্দীন খানের দেশে কোনো মেয়ের নজরুলের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হওয়া যে-সে কথা নয়। গুণী লোকেরা বলতে পারেন নজরুল কেমন বাঁশী বাজাত! মেয়েটির নাম আমি জানিনে, জানলেও ভুলে গেছি। পরে যে নামে তিনি পরিচিত হয়েছেন সেটা সম্ভবত তাঁর মা-বাবার দেওয়া নাম নয়। যা'ক, প্রথম পরিচয়ের পরে এই মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। নজরুল তাঁকে নিশ্চয়ই ভালোবেসেছিল। তারপরে কে যে প্রথম বিয়ের প্রস্তাব করলেন তা আমি জানিনে, তবে একথা ঠিক যে আলী আকবর খানের এই ভাগিনেয়ীর সঙ্গে নজরুলের বিয়ে স্থির হয়ে গেলো। নজরুল আর আলী আকবর খান দু'জনেই আমায় এই সম্বন্ধে পত্র লিখলেন, আরও অনেকে দু'জনের কিংবা দু'জনের মধ্যে এক জনের পত্র পেলেন। যথাসময়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রও এসে গেলো। কলকাতায় নজরুলের শুভার্থীদের মধ্যে আশঙ্কার সৃষ্টি হলো। তাঁরা ভাবলেন এত অল্প দিনের ভিতরে মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের কি এমন ভালোবাসা হয়ে গেলো যে সে হট করে তাকে বিয়ে করতে চললো! আমারও মোটেই ভালো লাগল না। রাগের মাথায় নজরুলকে পত্রও আমি লিখেছিলাম। কি লিখেছিলেন তা আজ আমার ভালো মনে নেই।

নজরুলের সঙ্গে ভাগিনেয়ীর বিয়ের প্রস্তাব হওয়া মাত্রই আলী আকবর খানের বাড়ীতে তাঁর অনাদৃত্য বুবুর (দিদির) মর্বাদা বেড়ে গেল। খান সাহেব তখনই তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন, “বুবু, তুমি সত্যি রত্ন প্রসবিনী”। সেদিন থেকে হুকুম হয়ে গেল তাঁদের ভাগিনেয়ীটি তাঁদের বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না, কারণ বিয়ে তাঁদের বাড়ীতেই হবে। তা ছাড়া এই ক'দিনের ভিতর গ্রাম্য মেয়েটিকে গড়েপিটেও তো নিতে হবে। আলী আকবর খান

তাই ভাগিনেরীকে নিয়ে পড়লেন। তিনি মেয়েটিকে নানান রকম পুঁথি পুস্তক পড়ে বোঝাতে লাগলেন। শরৎ সাহিত্যের নারী চরিত্র ইত্যাদি কিছুই তা থেকে বাদ গেল না। আলী আকবর খানদের পরিবারের কতৃৎস্বরূপা বিধবা বুবুর (দিদির) এত বাড়াবাড়ি মোটেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু গ্রেজুয়েট ভাইকে (বাড়ীতে আলী আকবর খানই একমাত্র গ্রেজুয়েট ছিলেন) ভয়ে কিছু তিনি বলতেও পারছিলেন না। এদিকে আলী আকবর খানের কোনো কোনো ব্যবহারে নজরুল নিজেকে অপমানিত বোধ করল, তার বাগদস্তার দু'একটি আচরণেও সে মনে মনে আহত হলো। মেয়েটিকে সে ভালও বেসেছিল। তা না হ'লে সে কিছুতেই বিয়েতে রাজী হতো না। সব মিলিয়ে সে হতভম্ব হয়ে পড়ল। কলকাতায় আমাদের যে এ বিষয়ে লিখবে সে মুখও তার ছিল না। কারণ, আমরা বিয়েতে রাজী ছিলাম না। তার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবছিল সে বেড়াজালে আটকা পড়ে গেছে, তার বুঝি আর মুক্তি নেই। অপমান ও হত্যার সে কখনও সহিতে পারত না। তাই সে বড় মুশড়ে পড়েছিল। এদিকে বিয়ের দিনও ক্রমশ ঘনিয়ে আসছিল।

কুমিল্লায় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ীতে বিয়ের নিমন্ত্রণ গিয়েছিল। সেখান থেকে খবরও এসে গিয়েছিল যে পুরো পরিবার বিয়ের উৎসবে যোগ দিবেন। দেশ তখন বর্ষায় ডুবে গিয়েছিল। তাই নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা ছিল। তাঁদের আগমনের জন্যে নজরুল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। যথাসময়ে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ীর প্রাত্যহিক এলেন। শিশুরাও বাদ থাকল না।

নজরুল শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী ও শ্রীবীরেন সেনকে তার অপমান ও হত্যাদরের কথা খুলে বলল। তাঁরাও দেখেশুনে ব্যাপারটি বুঝলেন। বিরজাসুন্দরী দেবী মত দিলেন যে বিয়েটি নজরুলের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না, নজরুলের ও-জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু অনেক অতিথি অভ্যাগত এসে গিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে নজরুলকে বিয়ের মজলিসে বসতে হলো, অকুণ্ঠ হয়ে গেলো। তারপরেই সে অতি প্রাতুষে অভ্যাগতদের স্তম্ভিত করে দিয়ে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনের সঙ্গে পায়ে হেঁটে কুমিল্লার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। এই হলো তার প্রথম বিয়ের ইতিহাস।

কুমিল্লা হ'তে নজরুলের একখানা ছোট্ট চিঠি পেলাম। তার ভাষা মনে থাকার কথা নয়। সে যা লিখেছিল তার মোদা কথা হচ্ছে যে সে আলী আকবর খানের দ্বারা প্রতারণিত ও অপমানিত হয়েছে। সে খুব অসুস্থ। আমি যেন তাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই। এক বন্ধুর নিকট ধার করে বিশটি টাকা আমি তাকে তখনই পাঠিয়ে দিলাম। কথাটা কলকাতার বন্ধুদের জানানো হলো। সকলে খুব চুঃখ করতে লাগলেন এবং আমায় ধরে বসলেন যে তখনই কুমিল্লা গিয়ে নজরুলকে কলকাতায় নিয়ে আসা উচিত। আমার কুমিল্লা যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাওয়ার পথে দু'টি বাধা ছিল। এক : আমার নিকটে টাকা ছিল না। দুই : গোয়ালন্দ হতে নীচের দিককার ঈমারের লোকদের ধর্মঘট চলছিল, ধর্মঘট চলছিল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতেও। সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে একখানা ঈমার ও একটি মাত্র ট্রেন চালু ছিল। এই অবস্থায় গোয়ালন্দ-চাঁদপুরের ঈমারেও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেনে চড়তে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। বন্ধুরা বললেন নজরুলের যখন অসুখ তখন এত কথা ভাবলে চলে কি? পবিত্র (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) বলল ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারকে সে চেনে, তাঁরা খুব ভালো লোক। বীরেন সেনকে সে ডাকে একখানা পত্রও লিখে দিল। শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। নজরুলের নিকটে তিনি প্রায়ই

আসতেন। তাঁর বাড়ীও ছিল নজরুলদের দেশের দিকে। তিনি যাতায়াতের খরচ বাবতে আমাকে ত্রিশটি টাকা দিলেন। সেকালে ঈমার-রেলওয়ের ভাড়া খুব কম ছিল। এই টাকার ওপরে ভরসা করে আমি কুমিল্লায় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম নজরুল অনেকখনি সামলে নিয়েছে। দৌলতপুর গ্রামে কি কি ঘটেছে তার প্রত্যেকটি কথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নজরুল আমায় জানালো। বীরেন সেনও যা জানতেন তা আমায় শোনালেন। আমি মনে মনে ভাবলাম আমাকে নিমিত্তের ভাগী করা যায় কি? আমার জন্মেই তো আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল।

শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় নজরুল তাঁদের পরিবারের এক জন হয়ে গিয়েছিল। আলী আকবর খানের বাড়ীর ঘটনার পরে এই বাসায় নজরুলের যত্ন আরও অনেক পরিমাণে বেড়েছিল। পাখা বিস্তার করে পাখী-মা যেমন ছানাদের আশ্রয় দেয় তেমনি আশ্রয় দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলকে। যে কারণে এই পরিবারের সঙ্গে নজরুলের এত বেশী খাপ খেয়ে গিয়েছিল তা আমি ওপরে উল্লেখ করেছি। দু'দিন কুমিল্লায় শ্রীসেনগুপ্তের বাসায় থেকে নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে আমি কলকাতার দিকে রওয়ানা হলাম। তখনও চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে একখানা ট্রেন চলছিল। চাঁদপুর পর্যন্ত এসে দেখা গেলো আমাদের টাকা কমে গেছে। আমরা চাঁদপুর ডাক বাংলায় উঠে কলকাতায় আফ্জাজুল হক সাহেবকে কয়েকটি টাকা পাঠানোর জন্মে টেলিগ্রাম করলাম। তিনি কুমিল্লার আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীকে (সে সময়ে কলকাতা ছিলেন) এই কথাটা জানাতেই চৌধুরী সাহেব চাঁদপুরে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগকে টেলিগ্রাম করে দিলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে নাগ মহাশয়ের নিকট হতে শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র সিংহ রায় (রাজবন্দী ছিলেন) ডাকবাংলায় এসে

আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বারটি টাকা আমাদের দিয়ে গেলেন ।
তারপরে আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছুলাম ।

নজরুলের কলকাতা পৌঁছানোর পরে আলী আকবর খানের ছোট ভাই-বী এবং আরও কে কে (সবই বাচ্চা) নজরুলকে পত্র লিখতে লাগল । তারপরে একদিন স্বয়ং আলা আকবর খান এসে উপস্থিত হলেন । তিনি অনেক সব কথা নজরুলকে বললেন । কথা বলার সময়ে একটি পুরু মতো নোটের তাড়া তিনি সব সময়ে নাড়াচাড়া করছিলেন । এই টাকাটা তিনি নজরুলকে দিতে চেয়েছিলেন । নজরুল খুব শক্ত হয়ে থাকল, টাকাটা স্পর্শ করল না । এর পরে আলী আকবর খান ঘর থেকে বা'র হয়ে গেলেন এবং যাওয়ার সময়ে আমায় বাইরে ডেকে নিলেন । আমায় তিনি বললেন—“আপনি কেন এই লোকটির জন্তে শক্তিক্ষয় করছেন ? আপনার উচিত নিজের মেয়ে ও ভাই-পো ভাই-বীদের ওপরে নজর দেওয়া ।’ আমি কিসের ওপর শক্তি ব্যয় করছিলাম তা হয়তো খান সাহেব পরে বুঝেছিলেন । যাক, ১৯১৩ সালে ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, আর শেষ দেখা হলো ১৯২১ সালে তালতলার (কলকাতার) একটি গলিতে ।

শুনেছি আঘাতেই নাকি কবিদের বীণা বেজে ওঠে । দৌলতপুরের প্রচণ্ড আঘাতের পরে নজরুল যখন কুমিল্লায় পৌঁছাল তখন তাঁর বীণায় অত্যন্ত দুর্দম সুরের বাজার উঠেছিল । এই সুর নৈরাশ্রে মুশড়ে পড়ার সুর ছিল না, স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান ছিল এই সুরে ।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছিল । কুমিল্লার রাস্তায় মিছিলে বা'র হয়ে নজরুল গেয়েছিল—

“এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা’র আঙ্গিনায় ।

ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায় ।

অধীন দেশের বাঁধন-বেদন

কে এলোরে করতে ছেদন ?

শিকল দেবীর বেদীর বৃকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায় ॥

* * * * *

পথের বাধা স্নেহের মায়ায়

পায় দ’লে আয় পায় দ’লে আয় !

রোদন কিসের ?—আজ যে বোধন !

বাজিয়ে বিঘাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয় ॥”

এই সময়ে কুমিল্লায় অণু একটি মিছিলে সে গেয়েছিল—

“আজি রক্ত-নিশি-ভোরে

একি এ শুনি ওরে

মুক্তি-কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,

ঐ কাহারো কারাবাসে

মুক্তি হাসি হাসে,

টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে ॥

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,

বক্ষে গুরুশিলা, হস্তে বক্ষন,

নয়নে ভাস্বর সত্য জ্যোতি শিখা,

স্বাধীন দেশ-বাণী কর্তে ঘন বোলে,

সে ধ্বনি ওঠে রনি’ ত্রিশ কোটি ঐ

মানব কল্লোলে ॥

ওরা ছুপায়ে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে
 সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে
 বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কারে,
 বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
 বন্দীশালা মাঝে ঝঙ্কা পশেছে রে
 উতল কলরোলে ॥”

*

*

*

*

*

এই সময়ে কুমিল্লাতেই নজরুল তার বিখ্যাত “মরণ-বরণ” গানটিও
 রচনা করেছিল। তা ছাড়া, আরও অনেক গীতি-কবিতা সে এই সময়ে
 রচনা করেছিল কুমিল্লাতে বসেই।

তার “পূবের হাওয়া”র অনেক কবিতাও কুমিল্লায় লেখা। এমন
 অনেক কবিতাও ওই সময়ে সে লিখেছিল যে-গুলিতে শ্রীযুক্তা বিরজা
 সুন্দরী দেবীর মনোভাব রূপায়িত হয়েছিল।

নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদার

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর “কল্লোল যুগ” নামক পুস্তকে লিখেছেন (৮৬ পৃষ্ঠা) :—

“নজরুলের গুরু ছিলেন মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে।” শ্রীসেনগুপ্ত নজরুলের একজন বিশিষ্ট বন্ধু, তিনি নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন। তিনি যা বলবেন বা লিখবেন সকলে তা সঠিক খবর বলেই ধরে নেবেন। তাঁর কলম থেকে বাকশক্তিহীন কবির সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়া মর্মান্তিক দুঃখের কথা। ১৯২০ সালে তাঁর বয়স কত ছিল তা আমার জানা নেই, তবে ১৭১৮ বছরের কম বোধ হয় ছিল না। তাঁর সাহিত্যিক শক্তির উন্মেষ নিশ্চয় তখন হ’তে শুরু হয়েছে। হয়তো তাঁর কিছু কিছু লেখা সে-সময়ে কাগজে ছাপা হয়েও থাকবে। তাই, নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর আরও বেশী ওয়াকিফহাল হওয়া উচিত ছিল। ১৯২০ সালে নজরুলের মাত্র ৩৪টি কবিতা মাসিক কাগজে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে একরকম রাতারাতি কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তার কবিতা কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে তখন বড় রকমের একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদারও। তিনিই প্রথম তাঁর নিজের প্রেরণায় “মোস্লেম ভারত”-এর সম্পাদককে একখানা সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রখানা বাঙলা ১৩২৭ সালের “ভাদ্র” সংখ্যক “মোস্লেম ভারত”-এ ছাপা হয়েছিল। নজরুল ইসলামের সঙ্গে কবি মোহিতলাল মজুমদারের চোখের দেখা তো দূরের কথা, চিঠিপত্রের পরিচয় পর্যন্ত তখনও হয়নি। বাঙলা কাব্য জগতে নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়কে অভিনন্দন জানিয়ে সে-সময়ে বড়োদা রাজ্যের সেন্সাস কমিশনার বিশিষ্ট

সাহিত্য-রসিক মিস্টার সত্যব্রত মুখার্জীও পত্র লিখেছিলেন। শাস্তি-
নিকেতন হ'তে শ্রীসুধাকান্ত রায়-চৌধুরী অভিনন্দন জানিয়েছিলেন,
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আরও অনেকে। কবি শ্রীমোহিতলাল
মজুমদারের “মোস্লেম ভারত”-এর সম্পাদককে লেখা পত্র হ'তে
আমি কিছুটা নীচে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :

“...কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশাঘিত
করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার
কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহু দিন কবিতা পড়িয়া
এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি
নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পরিয়াছে,
তাহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী—এক কথায়, সাহিত্য-
সৃষ্টির প্রেরণা যে তাহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে,
তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই
অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গলার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি,
এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যমোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক
সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কতব্য সম্পাদনে অগ্রসর
হইয়াছি।

* * * * *

“কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা
কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ বাক্যের ও ধ্বনি বৈচিত্র্যে এক কালে মুগ্ধ
হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী
মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া
সেই ছন্দ বাক্যের আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতার শব্দার্থ-
ময়ী কণ্ঠভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকৃতি ও হৃদয়স্পন্দনের
সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণপ্রীতিকর প্রাণহীন চারু-
চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায়

তাহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া, মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃ-উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যজ্ঞাবী গমন ভঙ্গী। “খেয়া পারের তরঙ্গী” শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে ; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথায়ও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই ; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কদি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায়, যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ-গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দ বাক্যে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,—

‘আব্বকর উস্মান উমরু আলী-হাইদর

দাঁড়ী যে এ তরঙ্গীর নাই ওরে নাই ডর।

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা

দাঁড়ি-মুখে সারিগান ‘লা শরীক আল্লাহ্’ !

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ-বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-উন্মক-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে ;—বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য—‘লা শরীক আল্লাহ্’—যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে !

“বাদল প্রাতের শরাব” শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুষ্পসার ও

দ্রাক্ষাসার ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিতেও কবির ‘মস্ত’ হইবার ও ‘মস্ত’ করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।” (মোহিতলাল মজুমদার—“মোস্লেম ভারত,” ভাদ্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ)।

আমার মনে হয় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত “মোস্লেম ভারত,”-এ প্রকাশিত মোহিতলালের পত্রখানি কখনও পড়েননি। পড়লে লিখতে পারতেন না মোহিতলাল নজরুলের গুরু ছিলেন এবং তিনি তাকে গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন। তারপরে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে গুরু-শিষ্যের রেওয়াজটি কখন থেকে চালু হলো? শ্রীঅচিন্ত্যকুমারের গুরু কে? রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকতা করতেন ব’লে প্রথমে তিনি শান্তি-নিকেতনের ছাত্রদের গুরুদেব হয়েছিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে দেশের গুরুদেবে পরিণত হয়েছেন। সেটা আলাদা ব্যাপার। আমি তো জানতেম পুরানো উর্দু সাহিত্যে একজন প্রবীণ কবি অপর একজন তরুণ কবির গুরু নামে অভিহিত হতেন। প্রবীণ কবি তরুণ কবির লেখাও শুদ্ধ ক’রে দিতেন। কিন্তু আমাদের বাঙলা সাহিত্যে এমন কোনো ব্যাপার ছিল ব’লে তো কখনও শুনিনি। “কল্লোলে” প্রকাশিত “সর্বনাশের ঘণ্টা” শীর্ষক কবিতায় (পুস্তকে “সাবধানী ঘণ্টা” নাম ছাপা হয়েছে) নজরুল মোহিতলালকে ‘দ্রোণাচার্য’ বলেছে, আর নিজেকে তাঁর ‘শিষ্য’ বলেছে। কিন্তু তার পিছনে অণু কারণ আছে।

নজরুল ইসলামের সহিত কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের প্রথম পরিচয় এবং উভয় কবির ছাড়াছাড়ির ব্যাপার আমি খুব নিকট থেকে দেখেছি। তাঁরা কি ভাবে মেলামেশা করতেন তা আমি ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ করেছি, তাঁরা নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করতেন তাও অনেক সময়ে আমি নিজের কানে শুনেছি। আমার দেখার

বা শোনার এই সুবিধা ছিল যে দীর্ঘকাল নজরুল আর আমাদের এক ঘরে বাস করতে হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য যে কবি বা সাহিত্যিক না হ'লেও আমি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের পরিচয়-দ্রষ্ট ছিলাম। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, সম্ভবত তিনিও আমার অশ্রদ্ধা করতেন না। আমার মনে হয় নজরুল আর মোহিতলালের সম্পর্কে আমারও কিঞ্চিৎ বলার অধিকার আছে। তাই আমি এখানে বলব।

“মিল নাই মিল নাই”

কবি-লেখক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের একখানি ছোট কবিতার বই আছে—নাম “রাখি”। এ-বইখানি তিনি শ্রীহিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিম্নোক্ত ক'ছত্র কবিতায় উৎসর্গ করেছেন :—

“আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখি,

একটি রজনী একটি শাখার শাখী।

তোমার আমার মিল নাই মিল নাই,

তাই বাঁধিলাম রাখি।”

(স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত)

নজরুল ইসলাম আর মোহিতলাল মজুমদারের ব্যাপার বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে যে তাঁদের দু'জনার মধ্যে কোনো মিলই ছিল না। তবুও তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন এবং পরস্পর রাখিও বেঁধেছিলেন। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীহিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাখি নিশ্চয় এখনও অটুট আছে। কিন্তু নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদারের রাখি কম-বেশি দেড় বছরের ভিতরেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

“মোস্লেম ভারতের” সম্পাদককে লেখা শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের পত্রই নজরুলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সেতু হয়েছিল। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুল নিজেই মোহিতলালের সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছিল। মোহিতবাবু তখন আমহান্ট' ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে থাকতেন। সেই বাড়ীতে তিনি কোনও কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। এই রকম সাক্ষাতের মানে তো অনেক আলোচনা ও অনেক কবিতার আবৃত্তি। অনেক পরিবার তা সইতে পারে না। মোটের ওপরে, আজ আমার মনে নেই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল। তার পরে তো বেশির ভাগ দেখা-সাক্ষাৎ আমাদের আস্তানাতেই হতো, মাঝে মাঝে অণু কোনও আড্ডাতেও হতো, কিন্তু মোহিতবাবুর বাস-ভবনে হতো না। যাক, মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম দর্শনের যে-বিবরণ নজরুল আমায় দিয়েছিল তা এই,—সাহিত্যিকদের অনেকের সম্মুখে মোহিতলাল বড় তিক্ত মনোভাব পোষণ করতেন। সেই সব সাহিত্যিকদের সংস্রব যেন নজরুল এড়িয়ে চলে এই অনুরোধ তিনি নজরুলকে করেছেন। আর, “প্রবাসী”তে কোনো লেখা নজরুল তো ছাপাতে পারবেই না, “প্রবাসী-গোষ্ঠীর” কোনো লোকের সঙ্গেও নজরুলের সম্পর্ক রাখা চলবে না, এই ছিল নজরুলের ওপরে মোহিতলালের স্নেহমাখা নির্দেশ। নজরুলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই মোহিতলাল তার কবিতা পড়ে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সে বয়ো-কনিষ্ঠ ছিল বলে প্রথম দর্শনেই তার ওপরে মোহিতলালের অজস্র স্নেহধারা বর্ষিত হয়েছিল। নজরুল সহজে স্নেহের অবমাননা করতে পারত না। এ বিষয়ে সে ছিল খুব দুর্বল।

নজরুলের সঙ্গে তো বটেই, ধীরে ধীরে আমার সঙ্গেও মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। তিনি শুধু বড় কবি ছিলেন না, পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। “প্রবাসী” ছিল সেরা মাসিক পত্র। “প্রবাসী”তে নজরুল তার লেখা ছাপাতে পারবে না মোহিতলালের এই স্নেহ-নির্দেশ আমার মোটেই পসন্দ হয়নি। আমি চাইতাম “প্রবাসী”তে নজরুলের লেখা অবশ্যই ছাপা হোক। কিন্তু মোহিতলালেরই জয়

হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পূর্বে নজরুল তার লেখা “প্রবাসী”তে ছাপাতে পাঠায়নি। অবশ্য, সে যখন পন্টনে ছিল তখন তার একটি ছোট্ট কবিতা “প্রবাসী”তে ছাপা হয়েছিল। আলাপ-পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে মোহিতলাল ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী। মহাভারতের আখ্যানের ওপরে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তিনি তার সমালোচনা করতেন, বলতেন কবিতায় যেখানে হিন্দুভাব ফুটে ওঠা উচিত ছিল তার জায়গায় ব্রাহ্মভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তিনি ভক্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভুলনা করতে গিয়ে বলতেন, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি কণা মাত্র পেয়েছেন। তবে, সাধারণভাবে ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব তিনি অত্যন্ত খোলা-খুলিভাবে ব্যক্ত করতেন। আর শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়দের সম্বন্ধে যে-ভাষা তিনি প্রয়োগ করতেন তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেতো। বাঙলার রাজনীতিক জীবনে ব্রাহ্মদের অবদান অনেক। সেজন্যে মোহিত-লালের ব্রাহ্ম-বিদ্বেষে আমি মনে মনে আহত হতাম।

আমি বলছিলাম মোহিতলাল আর নজরুল ইসলামের মধ্যে কোনও মিল ছিল না। মোহিতলাল ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক লোক। তাঁর পরিচয়ের পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অল্প সংখ্যক সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক লোকদের সঙ্গেই তিনি শুধু মেলাগেশা করতেন। তার বাইরে তাঁর পরিচয় ছিল তাঁর স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন হাইস্কুলের হেড মাস্টার। এক সময়ে তিনি বন্দোবস্ত বিভাগের কানুনগো ছিলেন। সেই সময়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাঁর কিছু সংযোগ ঘটে থাকবে, তার পরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আর কোনও সংযোগ ছিল না। তাঁর মধ্যে পসন্দ-অপসন্দর মনোভাব এত প্রবল ছিল যে সাহিত্যিকদের মধ্যেও বেশীর ভাগ লোকের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন না। দু-পাঁচ জনের মধ্যে বসে

রাজনীতিক কথাবাতা। যে তিনি একেবারেই বলতেন না তা নয়। আমার মনে আছে জর্জ ব্রাণ্ডেসের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ণিত রবার্ট এমেটের কাহিনীর প্রতি তিনি একদিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর একটি রাজনীতিক মত নিশ্চয় ছিল। তাঁর লেখার ভিতরে তা খুঁজতে হবে। কিন্তু খোলাখুলি ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। যাঁদের তিনি পসন্দ করতেন না তাঁদের তিনি অজস্র গালাগালি দিতেন। “বিটকেল” আর “মর্কট” এই দু’টি গাল তো তাঁর মুখে লেগেই থাকত। মোহিতলাল সুখী মানুষ ছিলেন না। যাঁর পরিচয়ের পরিধি এত সঙ্কীর্ণ তাঁর পক্ষে সুখী হওয়া মুশ্কিল।

নজরুল ইসলাম ছিল মোহিতলালের সম্পূর্ণ উল্টা। সকল স্তরের লোকের সঙ্গে তার মতো ব্যাপক পরিচয় কম লোকেরই ছিল। যাঁরা নজরুলের কবিতা বোঝেননি তাঁরা তার কবিতার সুর, ধ্বনি ও ছন্দ বাস্তবে মুগ্ধ হয়েছেন। তাই হয়ে তাঁরা আরও বেশী তার কবিতা শুনতে চেয়েছেন; অশিক্ষিত সাধারণকেও নজরুল তার গানের দ্বারা আকর্ষণ করেছে। সে শুধু গায়ক ছিল না হাজার হাজার গানের সে রচয়িতাও। এই কারণে নজরুল সর্বস্তরের মানুষের—বহু মানুষের কবি হতে পেরেছে, আর মোহিতলাল শুধু বিদগ্ধ সমাজের অর্থাৎ গণিত সংখ্যক মানুষের কবি। নজরুল জনগণের প্রতিনিধি ছিল। মোহিতলাল তা ছিলেন না এবং চেফ্টা করলেও তাঁর স্বভাবের দোষে তিনি তা হতে পারতেন না। অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নজরুল ছিল দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের একজন সৈনিক। এখানেও তার সঙ্গে মোহিতলালের বিরাট পার্থক্য ছিল। রুশিয়ার সর্বহারা বিপ্লবকে নজরুল মনে-প্রাণে সমর্থন করেছে, নানাভাবে সে-বিপ্লবের বন্দনা সে করেছে। এই ব্যাপারেও তার সঙ্গে মোহিতলালের মিল ছিল না।

মোহিতলাল মজুমদার নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে স্নেহাঙ্ক ছিলেন।

খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও তিনি নজরুলের স্বভাব কেন যে বোঝেননি তা ভেবে আজও আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দূরে থেকেও নজরুলকে বুঝেছিলেন। কবি রূপে প্রথম পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং তাঁর স্নেহও মে পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে শান্তি-নিকেতনে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নজরুল ছেলেদের কিছু কিছু ড়িল শেখাবে, আর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে গান শিখবে। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচার কথাটা বলেছিলেন। তিনি সম্ভবত নজরুলের কাব্য-সাধনা ও রাজনীতিক সংগ্রামে সমন্বয়ের চেষ্টা দেখে এই কথাটি ব'লে থাকবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরে নজরুলের ঝোঁক ধরতে পেরেছিলেন। তাই নজরুল যখন “ধূমকেতু” বা’র করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ভিঙা করেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে রাজনীতিক আশীর্বাদই করেছিলেন। তাঁর আশীর্বাণীর সেই ক’টি ছত্র অনেকেই মুখস্থ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

“কাজী নজরুল ইসলাম

কল্যাণীয়েষু—

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
 অঁধারে বাধ অগ্নিসেতু,
 হৃদিনের এই দুর্গশিরে
 উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
 অলক্ষণের তিলক রেখা
 রাতের ভালে হোক না লেখা,
 জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
 আছে যারা অর্ধচেতন!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”

২৪শে শ্রাবণ, ১৩২৯

কিন্তু দুভাগ্য যে মোহিতলাল এর কিছুই বুঝলেন না। তিনি প্রাণপণে নজরুলকে নিজের আকৃতিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকলেন। এই ভাবে গঠিত হওয়ার মানে আত্ম-বিলুপ্তি। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি কি তা সহ্য করতে পারে? মোহিতলাল নজরুলকে শেলি, কীটস, বায়রন আর ট্রাউনিং পড়তে বলতেন তার “বুদ্ধির দীপায়নের জন্মে”। দূরে থেকে যাঁরা শুনবেন তাঁরা বলবেন ভালোই তো বলতেন মোহিতলাল। কিন্তু নজরুলের জন্মে বিদেশী কবিদের কাব্য চর্চার প্রয়োজন ছিল কি? সে ছিল আমাদের দেশের মাটির সম্ভান। দেশের মাটি হতেই রস গ্রহণ করত সে। মাটির কাছাকাছি যে কবির বাণী শোনার জন্মে রবীন্দ্রনাথ কান পেতে ছিলেন নজরুল ছিল সেই কবি। তা ছাড়া, কারুর সঙ্গে বসে বই পড়ার ধৈর্য নজরুলের একেবারেই ছিল না। নিজে নিজে সে পড়তে পারত, খুব মনোযোগ সহকারেই সে পড়ত। নিজে নিজে অন্তত শেলির কবিতা সে কিছু কিছু পড়েছিল এবং শ্রমিকের ওপরে লেখা শেলির কবিতার ভাবাবলম্বনে সে কবিতাও লিখেছিল :

“ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী।

অলিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর

স্নেহ-স্নাত সব তোরা যে রে বীর,

পরম্পরের আশা যে রে তোরা,

মা’র সন্তাপহারী ॥

নিদ্রোথিত কেশরীর মত

উঠ্ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত !

আয়রে অজ্ঞেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী ॥

ঘুম ঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল

দেহ মন বেঁধে করেছে বিকল,

ঝেড়ে ফেল সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির বারি।

উহারা ক’জন ? তোরা অগণন, সকল শক্তিদারী ॥”

(“গণবাণী” ৫ই মে, ১৯২৭, হতে উদ্ধৃত)

আসল কথা, মোহিতলালের স্নেহের অত্যাচার নজরুল সহ্য করছিল, তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাও সে প্রকাশ করছিল না, কিন্তু তাঁর অতি ক্ষুদ্র

“পরিবেষ্টনে”র ভিতরে নজরুল যে দম আটকে মারা যাচ্ছিল একথাও সত্য। এর সাক্ষ্য আমি যেমন দিতে পারব তেমন বোধ হয় পবিত্রও (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) পারবে না। সাহিত্য সমিতি কিংবা আমাদের বাসায় মোহিতলাল যখন একান্তভাবে নজরুলের সঙ্গে মিশতেন তখন আমি পবিত্রকে সেখানে কখনও দেখিনি। পবিত্র অন্য সময় আড্ডা দিতে আসত। অবশ্য বাইরের আড্ডায় কি হতো তা আমি জানিনে। মোহিতলাল কোনো কোনো সময়ে ছ’এক জনকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। একজন ছিলেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মাসিক কাগজে তাঁর কবিতা ছাপা হতো। সরকারী কলেজের একজন অধ্যাপকও মাঝে মাঝে মোহিতলালের সঙ্গে আসতেন। কিন্তু কয়েক বছর আগে তিনি আমায় বলেছিলেন যে নজরুলকে তিনি চিনতেন না। তিনি ব্রাহ্ম। নজরুলের হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে ব্রাহ্মরা তার ওপরে চটে গিয়েছিলেন। এই অধ্যাপকের নাম আমি প্রকাশ করব না।

আমরা ক্রমেই বুঝতে পারছিলাম যে নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের বনিবনাও আর বেশী দিন থাকবে না। নজরুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এক দিনের কথা মনে আছে। মোহিতলালের স্কুলের ছুটি ছিল। তিনি ব্যারাকপুর অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ী ব্যারাকপুরে কিংবা কাঁচরাপাড়ার দিকে ছিল। সেখান থেকে তাঁর এক নব রচিত কবিতা নজরুলকে শোনার জন্যে তিনি কলকাতায় এলেন। কবিতাটি শুনে নজরুল বোধহয় ততটা উচ্ছাস প্রকাশ করল না যতটা তার করা উচিত ছিল। মোহিতলাল ক্ষুব্ধ হলেন। আমি যখন বাইরে যাচ্ছিলাম তখন মোহিতলালও নজরুলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আমার সঙ্গে বা’র হয়ে এলেন। তিনি আমায় বললেন “দ্রেনের পয়সা খরচ করে নজরুলকে কবিতা শোনার জন্যে আমি এতদূর হতে এলাম, অথচ কবিতা শুনে নজরুল তেমন কোন আনন্দই প্রকাশ করল না।” আমি বুঝলাম এটা ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ।

“বিদ্রোহী” কবিতা

অন্য যে-কোনো উপলক্ষে বাড় উঠতে পারত, কিন্তু বাড় উঠল নজরুলের “বিদ্রোহী” শীর্ষক কবিতাটি নিয়ে। এই কবিতাটি কাগজে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন শুরু হলো। সর্বত্র কবিতাটির আরাধিত হতে লাগল, নজরুল নিজেও অনুরুদ্ধ হয়ে আরাধিত করতে লাগল। পাঠক ও শ্রোতাদের মধ্যে নজরুলের জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল। কবি মোহিতলাল মজুমদার কিন্তু খুশী হলেন না। তিনি এ-কে ও-কে বলে বেড়াতে লাগলেন যে নজরুল তাঁর ভাব নিয়ে (তখনও চুরি করার কথা বলা শুরু করেননি) সমস্ত কবিতাটি লিখেছে, অথচ তার ঋণ স্বীকার করেনি। এখানে কিছু পুরানো ঘটনা বিবৃত করা দরকার। ১৯২০ সালের কথা। নজরুলের সঙ্গে কবি মোহিতলাল মজুমদারের সবে মেলামেশা শুরু হয়েছে, তখনও নজরুল আর আমি ৩২, কলেজ স্ট্রীটের বাড়ী (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বাড়ী) ছেড়ে বাইনি। এই সময়ে মোহিতলাল এক দিন আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে সাহিত্য সমিতির লাইব্রেরীতে “মানসী” (“মানসী ও মর্মবাণী” নয়) নামক মাসিক পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলি আছে কিনা? আছে বলাতে তিনি একটি নির্দিষ্ট বছরের নির্দিষ্ট সংখ্যক কাগজখানা চাইলেন। আমি তাঁকে সে বছরের কাগজের সংখ্যাগুলি বাঁধানো অবস্থায় এনে দিলাম। তা থেকে তিনি তাঁর ৬৭ বছর আগেকার, ১৩২১ সালের লেখা “আমি” শীর্ষক একটি গল্প লেখা আমাদের পড়ে শোনালেন। আমাদের মানে নজরুল আর আমি এবং সম্ভবত আফ্জালুল হক সাহেবও ছিলেন। তাঁর উপস্থিতির কথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারছি। এই প্রবন্ধে কি লেখা ছিল তা আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে গিয়েছিলাম। কারণ, ওই পৌঁচানো পাণ্ডিত্যের বা

কবিত্বের কিছুই আমি বুঝিনি। নজরুল তো কবি। তার নিশ্চয়ই বোঝার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সেও মনোযোগ দিয়ে মোহিতলালের প্রবন্ধ পাঠ শুনছিল না।

ওই রকম একটি গল্প প্রবন্ধ পাঠ অভিনিবেশ সহকারে শোনার মত ধৈর্যই নজরুলের ছিল না। কবিতা হলে অনেকটা সে মনোযোগ দিয়ে শুনত, চাই কি কবিতাটির কয়েক ছত্র তার মুখস্থও হয়ে যেত। আর গান হলে সে তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিত করে তা শুনত, গায়কের তাল কেটে গেলে সে খুব বেদনাও বোধ করত। এই রকম ছিল নজরুল। সেই নজরুল কিনা প্রায় দেড় বছর আগে মোহিতলালের ‘আমি’ শীর্ষক গল্প লেখা তাঁকে একটি বার মাত্র পড়তে শুনে (খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেও) তার সমস্ত ভাব সম্পদ নিজের মনের মণিকোঠায় আবদ্ধ করে রাখল, আর তা ঢেলে দিল তার “বিদ্রোহী” কবিতায়, এও কি সম্ভব? নজরুলের প্রতিভার কথা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু তার মন রেকর্ড করার ফিতা যে ছিলনা তাও সকলকে স্বীকার করতে হবে। শোনা মাত্রই তাতে সব কিছু লেখা হয়ে যাবে এমন অসম্ভব প্রতিভা নজরুলের ছিল না।

নজরুলের “বিদ্রোহী” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলায় একটা আলোড়ন উঠেছিল। ১৩২১ সালে প্রকাশিত মোহিতলালের “আমি”র ভাবসম্পদ ধার করে, মোহিতলালের ভাষায় চুরি করে, যদি তা লেখা হয়ে থাকে তবে “আমি” প্রকাশের পরে বাঙলার সাহিত্যিক মহলে কিঞ্চিৎও আলোড়ন হ’লনা কেন? ১৩২১ সালেও আমি কলকাতার বাশিন্দা ছিলাম। মাসিক কাগজের পাতা উন্টানোর অভ্যাসও আমার ছিল। কিন্তু “আমি” নিয়ে কোথায়ও কোনো আলোচনা দেখেছি ব’লে তো মনে পড়ে না। শ্রীমুরেশচন্দ্র সমাজপতি তখন জীবিত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি যে “আমি” এড়িয়ে গেল এটা কি করে সম্ভব হলো? এমন নয় যে ১৩২৮ সালে আলোড়নের যুগ ছিল,

আর ১৩২১ সাল তা ছিল না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভ্যুদয় তো তখন বাঙলা দেশকে জোর মাতিয়ে তুলেছিল। আসলে মোহিতলালের প্রবল আত্মমুখীনতাই ছিল এই সব কিছুর জন্ম দায়ী। নজরুল যদি মোহিতলালের স্নেহ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করত তবে এই জাতীয় কোনো কথাই উঠত না। কিন্তু বিদ্রোহ না করলে নজরুল বাঁচত না, মোহিতলাল বাঁচতেন। তাঁর জীবনে আরও সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তবে নজরুলের বিদ্রোহ তাঁর বড় বেশী বেজেছিল। এমন ভালো হয়তো তিনি আর কোনও কবিকে বাসেননি। তাই মোহিতলালের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়া বেদনাময় তো ছিলই, অসমর্থনীয়ও ছিল।

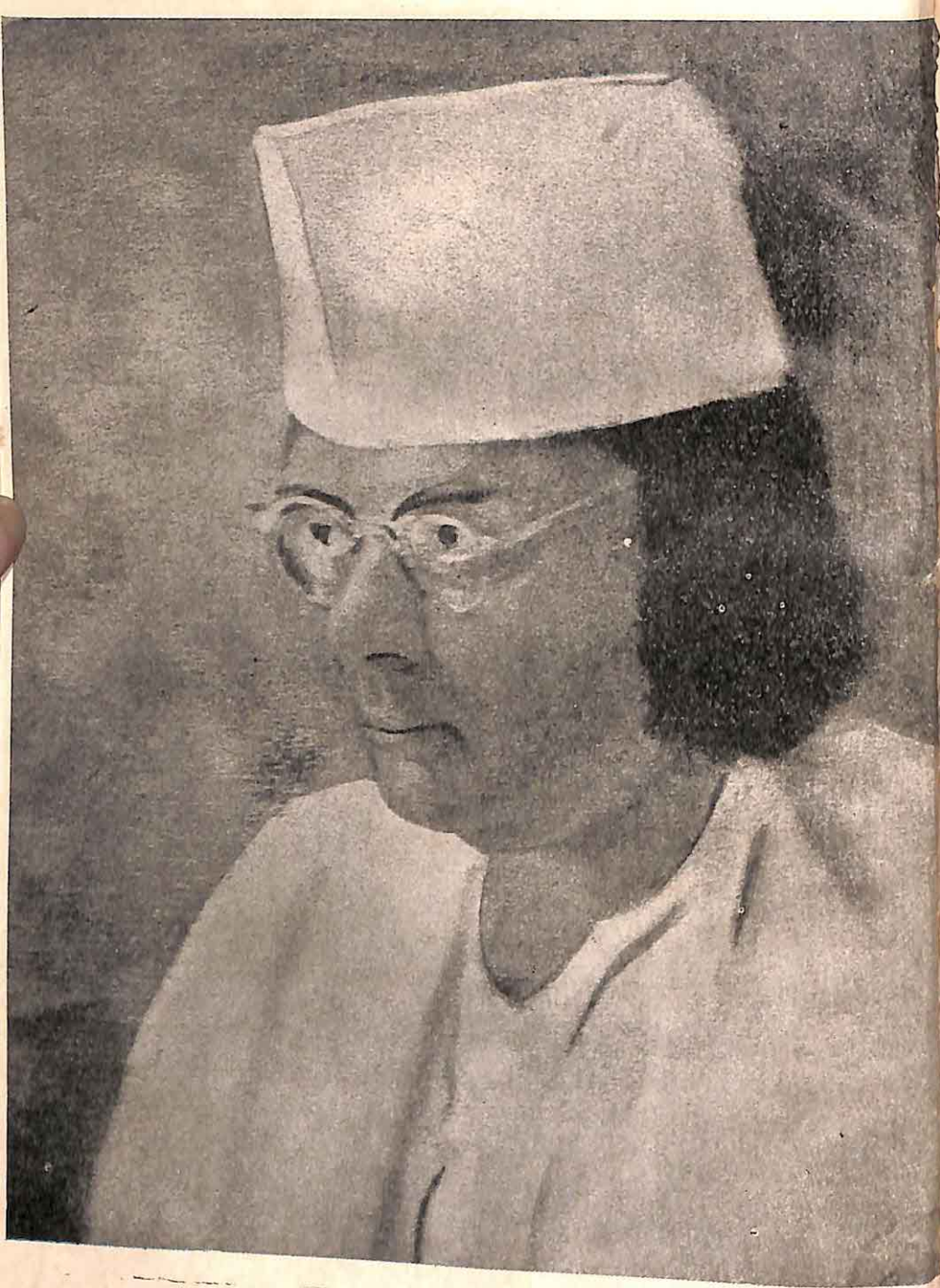
“বিদ্রোহী” কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর যদিও মোহিতলাল এখানে-ওখানে ব’লে বেড়িয়েছিলেন যে, নজরুল তার ভাব নিয়ে কবিতা লিখেছে, খণ স্বীকার করেনি, তবুও তিনি নজরুলের নিকট যাতায়াত বন্ধ করেননি। ১৯২২ সালে ৭, প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে “ধূমকেতু” আফিসেও তিনি আসতেন। নজরুল হিন্দু দেব-দেবীর কথা কবিতায় লিখতেন ব’লে তিনি বলতেন যে “স্বধর্মের নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।” কিন্তু “বিদ্রোহী” কবিতা রচনা সম্পর্কে মোহিতলাল কোন কথাই তখন নজরুলের নিকট তুলতেন না। নজরুলও এ বিষয়ে তাঁর সম্মুখে নির্বাক থেকেছে। নজরুল ও মোহিতলালের স্বভাবে যে কোন মিল ছিল না সে-কথা আমি ওপরে বলেছি। যতটুকু মিল তাঁদের মধ্যে হয়েছিল তাও যে “বিদ্রোহী” রচনার অনেক আগে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তারও আভাস আমি ওপরে দিয়েছি। নজরুল ইতোমধ্যে প্রবাসীতে কবিতা পাঠানো শুরু করেছিল। “প্রবাসী” কবিতা ছেপে তার জন্তে নজরুলকে টাকাও দিচ্ছিল। কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে নজরুল যখন বিচারাধীন বন্দী ছিল তখনও গোপন পথে “প্রবাসীতে” সে তার কবিতা ছাপতে পাঠিয়েছে।

১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে ফৌজদারীর দণ্ডবিধি আইনের ১২৪-ক ধারা অনুসারে নজরুল এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। ওই বছরের মে মাসে আমিও গিরেফতার হলাম। তারপরে কলকাতায় ফিরলাম ১৯২৬ সালের শুরুতে। কলকাতায় এসে যা শুনলাম ও দেখলাম তাতে বুঝলাম যে কলকাতায় একটি বড় রকমের ওলট-পালট হয়ে গেছে। দেখা গেলো, যে-“প্রবাসী”-গোষ্ঠীর, বিশেষ করে, তার ব্রাহ্ম মালিকদের ওপরে অজস্র গালি বর্ষণ মোহিতলালের নিত্যকর্মের অঙ্গীভূত ছিল, যে-“প্রবাসীতে” তিনি নজরুলকে কিছুতেই কবিতা ছাপাতে দেননি, তিনি নিজেই সেই “প্রবাসীর দলে যোগ দিয়েছেন। তিনি এখানেও থামেননি, ভিড়ে পড়েছেন ‘শনিবারের চিঠি’তেও। এই “শনিবারের চিঠি”র বিশেষ কাজ ছিল নজরুলকে অসাহিত্যিক আক্রমণ করা।

কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সহিত আমার শেষ দেখা হয়েছিল হ্যারিসন রোডের (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) ফুটপাথে। বললেন আমার সঙ্গে যে তাঁর আর দেখা হবে একথা তিনি ভাবতেও পারেন নি। জেলখানায় আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল একথা তিনি শুনেছিলেন। একটি রেস্টোঁরায় বসে আমাকে নিয়ে চা খেতে চাইলেন। কিন্তু বড় কোনও অসাম্প্রদায়িক রেস্টোঁরা কাছাকাছি ছিল না। তখনও কলকাতায় মুসলিম নামধারী লোকেরা যে কোনও রেস্টোঁরায় ঢুকে চা পান করবেন এই রেওয়াজ চালু হয়নি। মোহিতলাল একটি ছোট রেস্টোঁরাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করাতে মালিক চা দিতে রাজী হলেন। জীবনে শেষবারের মতো তাঁর সঙ্গে বসে সেই রেস্টোঁরায় চা খেয়েছিলাম। অনেক কথাই তিনি বললেন, কিন্তু নজরুলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করলেন না, শুধু বললেন, সে শরীরের প্রতি যত্ন নিচ্ছে না। নজরুল তখন হুগলীর বাসা ভুলে দিয়ে কৃষ্ণনগরে বাস করছিল। ছ’টিই ম্যালেরিয়া প্রধান জায়গা ছিল। সে দারুণ ম্যালেরিয়ায়



৩২, কলেজ স্ট্রট, কলিকাতা। এই বাড়ীর দোতলায় “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি”র অফিস ও পাঠাগার ছিল। ৪৯ নম্বর বাঙালী পণ্টন ভেঙে দেওয়ার পরে কাজী নজরুল ইসলাম কলিকাতায় এসে প্রথম এই বাড়ীতে উঠেছিলেন। তাঁর আগমনের পরে এই বাড়ীটি কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক কর্মীদের বিশেষ মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।



ভুগছিল। বিদায় নেওয়ার সময়ে মোহিতলাল বললেন আমায় তিনি তাঁর কবিতার বই পাঠিয়ে দিবেন। অবশ্য পরে বই পাঠাতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের রাজনীতির ওপরে মোহিতলাল বিদ্রিষ্ট ছিলেন। কবিরাও যে প্রচারক তার পরিচয় এখানেই পাওয়া যায়।

ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বন্ধুদের অনুরোধে নজরুল “সর্বনাশের ঘণ্টা” নাম দিয়ে কবিতা লিখেছিল। ১৩৩১ সালের কার্তিক মাসের “কল্লোলে” এই কবিতা ছাপা হয়েছিল। নজরুলের একটি পুস্তকেও এই কবিতা “সাবধানী ঘণ্টা” নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে। এই কবিতাটিতে নজরুল তার আক্রমণকারীদের, বিশেষ করে কবি মোহিতলাল মজুমদারকেও আক্রমণ করেছে। কিন্তু তার আক্রমণকারীদের ভাষার তুলনায় নজরুলের ভাষা অনেক সংযত। কি কারণে জানি না, মোহিতলাল নজরুলের গুরুনামে অভিহিত হ’তে চাইতেন। নজরুলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বে যে-পত্র তিনি “মোস্লেম ভারত”-এর সম্পাদককে লিখেছিলেন তার পরেও তিনি কি করে যে নজরুলের গুরু হন তা বোঝা আমাদের পক্ষে মুশকিল। কিন্তু এই দিক থেকে নজরুল বিনয়ী। মোহিতলালকে খুশী করার জন্য সে তাঁকে গুরু সম্বোধনও করেছে। তবে তা মোহিতলালের হৃদয়স্পর্শ করেনি। সর্বনাশের ঘণ্টায় নজরুল লিখেছে—

“হে দ্রোণাচার্য! আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
 ঘেঘ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
 শিষ্য তোমার ;

এই উদ্ভরে মোহিতলাল তাঁর “দ্রোণগুরু” শীর্ষক কবিতায় যা লিখেছিলেন তারও কিঞ্চিৎ নমুনা নীচে দিচ্ছি :—

“আমি ব্রাহ্মণ, দিব্য চক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
 অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর !
 আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
 সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
 গুরু ভার্গব দিল না তুহারে !—ওরে মিথ্যার রাজা !
 আব্রপূজার ভণ্ড পূজারী ! যাত্রার বীর সাজা
 ঘুটিবে তোমার,—মহাবীর হওহা মর্কট সভাতলে !
 দুদিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে !
 অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস
 চরম-ক্ষণে মোহিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস !

(“জাগরণ” কাগজে প্রকাশিত আজ্জহার উদ্দীন খানের “মোহিত-
 নজরুল বিরোধ” প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

এখানে মোহিতলাল তাঁর ভাষার সব সংযম হারিয়ে ফেলেছেন ।
 তারপরে, তিনি কুসংস্কারেও আচ্ছন্ন । কোনও প্রগতিশীল ব্যক্তি
 কি অভিসম্পাতে বিশ্বাস করতে পারেন ? এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন
 নিয়েই তিনি বাঙলার একজন বড় কবি !

নজরুলের জীবনী-লেখক জনাব আজ্জহার উদ্দীন খান “বাংলা
 সাহিত্যে মোহিতলাল” নাম দিয়ে বই লিখেছেন । এই পুস্তকের
 একটি বিশেষ অধ্যায়ের অংশ বিশেষ তিনি ১৩৬৫ সালের জ্যৈষ্ঠ
 সংখ্যক (মে, ১৯৫৮) “জাগরণ” কাগজে “মোহিত-নজরুল বিরোধ”
 শিরোনাম দিয়ে ছেপেছেন । তাতে লেখা আছে তাঁর গ্রন্থটি
 প্রকাশমান । এত দিনে তা হয়তো ছাপা হয়ে গেছে । তাঁর এই
 লেখাতেও তথ্যের ভুল আছে । তিনি লিখেছেন—

“বিদ্রোহী” কবিতা প্রকাশের পর কাজীর বহু তরুণ বন্ধু জুটে
 গেল । মোহিতলাল হৈ চৈ ভাল বাসতেন না । কাজেই আস্তে
 আস্তে সরে দাঁড়ালেন । সে কথা নজরুল লিখেছেন তাঁর “আমার
 কৈফিয়ৎ” কবিতায় ।

গুরু কন, তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা ।

কিন্তু তখনও বাদ-বিবাদ হয়নি। “অগ্নিবীণা” “দোলন চাঁপা” “বিষের বাঁশী” কাব্য গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজী মোহিতলালকে উক্ত গ্রন্থের প্রত্যেকটি কপি দিয়েছিলেন।”

আজ্জহার উদ্দীন সাহেবকে কে কি বুঝিয়েছেন জানিনে, কিন্তু নজরুলের “গুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা”য় যে-গুরুর কথা বলা হয়েছে তিনি রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদার নন। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথই নজরুলকে তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচার কথা বলেছিলেন। একথা একেবারেই সত্য নয় যে “বিদ্রোহী” কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরে নজরুলের অনেক তরুণ বন্ধু জুটে হৈ চৈ শুরু ক’রে দেওয়ার ফলে মোহিতলাল সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কি অবস্থায় তিনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন তা আগেই আমি বলেছি। আর, নজরুলের তরুণ ও অতরুণ বন্ধুরা তো সেই ১৯২০ সালেই জুটেছিলেন; তাঁদের মধ্যে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিও নিজেকে তখন তরুণ মনে করতেন। একটি বাইশ বছরের যুবক যদি কবিতা লিখে সকলের চমক লাগিয়ে দেয়, যদি কবিতা আকর্ষণ ক’রে, গান গেয়ে ও দিলখোলা হাসির তোড়ে লোক আকর্ষণ করার তার অসাধারণ শক্তি থাকে, তবে তার চার পাশে তরুণের দল জুটবেন না? নজরুলকে নিয়ে আলোড়ন শুরু হয়েছিল ১৯২০ সাল হতেই এবং সেই আলোড়নে মোহিতলালও যুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালের আগে নজরুলের কোন পুস্তক প্রকাশিত হয়নি। ১৯২২ সালে তার দু’খানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল—“যুগবাণী” ও “অগ্নিবীণা”। “যুগবাণী” গদ্য লেখা,—দৈনিক ‘নবযুগের’ প্রবন্ধ সংকলন। নজরুলের প্রথম পুস্তক ছিল এটাই। মোহিতলালের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৯২১ সালে। “বিদ্রোহী”

কবিতাকে নিয়ে মোহিতলাল এই বিদ্রোহকে বিরোধে পরিণত করেছিলেন। নজরুল মোহিতলালকে তার বইগুলি উপহার দিয়েছে বটে, কিন্তু বিরোধ শুরু হওয়ার পরেই উপহার দিয়েছে।

একটি কথা আজ্জহার উদ্দীন সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করব। তিনি কি ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যক “মোস্লেম” ভারতে প্রকাশিত মোহিতলালের পুরো চিঠিখানি পড়েছেন? যদি পড়ে থাকেন তবে সেই চিঠিটার যে অংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করেছি তিনি তা করলেন না কেন? চিঠিখানির এমন একটি অংশ তিনি কেন উদ্ধৃত করলেন যা থেকে নজরুলকে ভালো বলা বা মন্দ বলা কিছুই বোঝায় না? মনে হয় অণু, কারুর উদ্ধৃতিতে তিনি নিজের লেখায় উদ্ধৃত করেছেন। পুরো চিঠিখানা তিনি যদি পড়ে নিতেন তবে তাঁর অনেক ভুল ভেঙে যেতো। কেন যে তিনি লোকের মুখে শুনে লেখেন, কেন নিজে যাচাই করেন না, কে জানে? এক্ষেত্রে তাঁর যাচাই ক’রে নেওয়া সম্ভব ছিল।

আজ্জহার উদ্দীন সাহেব আরও লিখেছেন “শনিবারের” চিঠি”তে “গাজী আব্বাস, বিটকেল” ও “আবাহন” শীর্ষক কবিতা দু’টি যখন বের হয়েছিল তখন শ্রীসজনীকান্ত দাসের সহিত মোহিতলাল পরিচিত হননি। এ কবিতা দু’টি সজনীকান্ত দাসের লেখা। “বিদ্রোহী”কে ব্যঙ্গ ক’রে যে “ব্যাঙ” নামক কবিতা বের হয়েছিল তাও শ্রীসজনীকান্ত দাসের লেখা। আজ্জহার উদ্দীন সাহেবের এসব তথ্য সত্য নয় এমন কথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু নজরুল ও তার বন্ধুদেরও মোহিতলালের উপরে সন্দেহ করার কারণ ছিল। কেননা তিনি “প্রবাসী” গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন, আর এই গোষ্ঠীর সঙ্গে “শনিবারের চিঠি”র সম্পর্ক ছিল। আমরা জানা নেই, মোহিতলালের নিজস্ব কথা “বিটকেল” ইত্যাদির ব্যবহার হতেও সন্দেহের কারণ ঘটেছিল কিনা। মোটের ওপরে, মোহিত-

লালের “প্রবাসী” গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়া আশ্চর্য নয় কি? কোনো নীতির বালাই থাকবে না তাঁর?

আজ্জহার উদ্দীন খান শিক্ষিত যুবক। তিনি বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে লিখছেন যখন বিজ্ঞান তার নব নব আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের জ্ঞানের পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়ে যাচ্ছে। আজকার দিনেও তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের ওপরে মানুষের অভিশাপে? তিনি বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে কবি নজরুল ইসলাম কবি মোহিতলাল মজুমদারের অভিশাপে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে আছে। এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে লেখক তিনি এযুগের লেখক হবেন কি করে? কবি মোহিতলাল, মজুমদারও অকালে মরেছেন। আমাদের কি ভাবতে হবে যে তিনি কোনো না কোনো লোকের অভিশাপ অকালে মরেছেন?

রুশ বিপ্লব, লাল ফৌজ ও মজুর শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার প্রতি নজরুলের আকর্ষণ

“বাথার দান” নজরুল ইসলামের একখানা বহু প্রশংসিত গল্প-পুস্তক। এই পুস্তকের প্রথম গল্প “বাথার দানে” বিপ্লবের পরের রুশ দেশের প্রতি নজরুল যে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। করাচির সেনা-নিবাসেই ১৯১৮ সালে এই গল্পটি লিখিত হয়। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যক “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা”য় “বাথার দান” ছাপা হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় হিসাবে এটা ছিল ১৯১৯ সাল। তা থেকে কেউ কেউ মনে ধারণা করে নিয়েছেন যে গল্পটি আসলে ১৯১৯ সালের লেখা। কিন্তু তা ঠিক নয়। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা” ছিল একখানি ত্রিমাসিক কাগজ। তার কার্তিক সংখ্যায় (১৯১৮) আমরা নজরুলের “হেনা” শীর্ষক একটি গল্প ছেপেছিলাম। তাই “বাথার দান” ১৩২৬ বঙ্গাব্দের মাঘ (১৯১৯) সংখ্যার আগে ছাপানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই দু’টি গল্পই ১৯১৮ সালে পরে পরে আমাদের হাতে এসেছিল। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে রুশ দেশে সর্বহারা (প্রোলেটারিয়েট) বিপ্লব ঘটেছিল। তার এক বছর পার না হতেই নজরুল তার “বাথার দান” শীর্ষক গল্পটি লিখেছিল। কত তাড়াতাড়ি নজরুলের মন এই বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা লক্ষণীয় বলেই গল্প লেখার আসল সনের ওপরে আমি ‘এত বেশী জোর দিচ্ছি।

“ব্যথার দান” গল্পটি সহ মাঘ সংখ্যার কাগজ ছাপাতে গিয়েও আমরা কিঞ্চিৎ মুশ্কিলের সম্মুখীন হয়েছিলেম। ত্রিমাসিক কাগজ ছাপানোর জন্তে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হ’তে কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হতো না। যে-কোনো প্রেসে তা ছাপানো যেতো। আমরা স্থির করেছিলেম মাঘ সংখ্যার কাগজখানা মিডল রোড ইন্টার্লীতে অবস্থিত ইণ্ডিয়া প্রেসে ছাপাব। এই প্রেসটি কেত-দুরন্ত প্রেস ছিল। এর ছাপাও ভাল হতো। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সম্পাদিত “গৃহস্থ” নামক মাসিক পত্রিকা এই প্রেসেই ছাপা হতো। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে আমি প্রেসের মালিক শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষের সঙ্গে দেখা করি এবং “ব্যথার দান” ও অগ্নি লেখার পাণ্ডুলিপি তাঁর নিকটে রেখেও আসি। তখনকার দিনে পাণ্ডুলিপি না প’ড়ে কোনও কিছু ছাপানো প্রেসের মালিকের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এর পরে আমি যখন প্রেসে গেলাম তখন শ্রীযুক্ত ঘোষ আমায় পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিলেন। “ব্যথার দানে” যে দেশাত্ম-বোধের পরিচয় আছে তার জন্তে তিনি আমাদের অভিনন্দন জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বললেন যে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের জন্ত তাঁর প্রেসের ওপরে পুলিশের অশুভ দৃষ্টি থাকায় আমাদের পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিতে হলো বলে তিনি দুঃখিত। বাধ্য হয়ে আমি পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে এসে অগ্নি প্রেসে ছাপাবার ব্যবস্থা করলাম।

“গোলেস্তান! অনেকদিন পরে তোমার বুক ফিরে এসেছি। আঃ মার্টীর মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল!——মাতৃ-স্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হ’তে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি।” গল্পের এই শুকটাই শ্রীযুক্ত ঘোষকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আমাদের পরাধীন দেশে দেশপ্রেম ছিল অপরাধ। তিনি ভয় না পেয়ে কি করবেন, বিশেষ

করে তাঁর প্রেসের ওপরে যখন পুলিশের নজর ছিল ?

“ব্যথার দান” একটি ভালোবাসার গল্প। এই গল্পের ভিতর দিয়েই ব্রিটিশের একজন ভারতীয় সৈনিক, বিশ বছরের যুবক নজরুল ইসলাম যে রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিকতা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কথাটি বুঝবার জন্যে গল্পটি কিভাবে দাঁড় করানো হয়েছে সে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু’এক কথা বলা দরকার। ঘটনার স্থান বেলুচিস্তানের গুলিস্তান, চমন ও বুস্তান প্রভৃতি জায়গা। এসব জায়গা হতে সোবিয়ৎ সীমানায় যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। দু’জন যুবক—দারা আর সয়ফুল মুন্স্ এবং একটি যুবতী—বেদোঁরাকে নিয়ে গল্পটি লেখা। দারার মারার সময়ে তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী বেদোঁরাকে দারার হাতে সঁপে দিয়ে যান এবং বলে যান দারা যেন কোনও অবস্থাতে বেদোঁরাকে না ছাড়ে। তাদের দু’জন দু’জনকে আগে হতেই গভীরভাবে ভালোবাসত। কিন্তু এর মধ্যে কোথা হতে বেদোঁরার এক ভণ্ড মামা এসে জোর করে তাকে দারার নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। সেই থেকে দারা বেদোঁরাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। বেদোঁরাও একদিন তার ভণ্ড মামার জাল ছিন্ন করে পালিয়ে এলো। সেও খুঁজতে লাগল দারাকে। এই সময়ে সয়ফুল মুন্সের সাথে বেদোঁরার দেখা হলো। সয়ফুল মুন্স্ বেদোঁরার মনে নানারকম সন্দেহের সৃষ্টি করল এবং তাকে প্রলুব্ধও করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বেদোঁরা সয়ফুল মুন্সের লোভের নিকটে ধরা দিল। কিছুদিনের ভিতরে সয়ফুল মুন্স্ বুঝতে পারে যে বেদোঁরার হৃদয়ে তার কোনও স্থান নেই, বেদোঁরা তখনও ভালোবাসে একমাত্র দারাকেই। সয়ফুল মুন্স্ অনুতপ্ত হয়ে বেদোঁরার নিকটে ক্ষমা চাইল। সে প্রতিজ্ঞা করল ভালো কাজে আত্মবলি দিয়ে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। এর পরে দারার সঙ্গে বেদোঁরারও

সাক্ষাৎ হয়। সে সব কথা দারাকে খুলে বলে। দারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্তে এলো যে বেদোঁরার কোনও দোষ নেই। কিন্তু সে তার মনের গহনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল যে সেখানে হিংসা বাসা বেঁধেছে। এর জন্তে দারার রাগ হলো নিজের উপরে। সে তার মন হতে হিংসা ধুয়ে ফেলার জন্ত বেদোঁরার নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তারপরে সয়ফুল মুন্স বলছে : “ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই লাল ফোঁজে যোগ দিলুম। এই পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে করেছে, এদের এই মহান্ নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে, যে, কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান্ ব্যক্তিসম্ভের একজন।

* * * * *

“কিন্তু সহসা একি দেখলুম? দারা কোথা থেকে এখানে এল? সেদিন তাকে অনেক করে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, ‘এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলাম না, তাই এই দলে এসেছি।’

লাল ফোঁজে যোগ দিয়ে নিজেকে এতটুকুও না বাঁচিয়ে দারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করতে লাগল। সে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল, তবুও হাসপাতালে যাচ্ছিল না। তার কৃতিত্বের জন্তে লাল ফোঁজে বড় পদ সে পেল। শেষ পর্যন্ত লাল ফোঁজের জয়লাভও হলো, কিন্তু দারা তখন অন্ধ ও বধির।

১৯১৭ সালে নবেম্বর বিপ্লব কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট চারদিক আটঘাট বেঁধে ফেলতে লাগল।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবেম্বর বিপ্লবের কোনো হাওয়া যেন ভারতে প্রবেশ করতে না পায়। ভারত গবর্নমেন্টের ইন্টেলিজেন্স বিভাগটি নূতনরূপে গড়ে তোলা হলো এবং প্রাদেশিক পুলিশের বিশেষ বিভাগগুলিও কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নির্দেশে তৎপর হয়ে উঠল। এই পুলিশ গোষ্ঠী নবেম্বর বিপ্লব ও তার পরবর্তী খবর ভারতে পৌঁছানো একরকম অসম্ভব করে তুলেছিল। তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি নবেম্বর বিপ্লবের খবর করাচির সেনা-নিবাসে পৌঁছেছিল। এবং খবর পৌঁছেছিল লাল ফৌজ গঠিত হওয়ারও। নজরুলের গল্প হ'তে ওপরে যে উদ্ধৃতি আমি দিয়েছি তা থেকে তার পরিকার প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা বুঝতেও আমাদের কোনও বেগ পেতে হয় না যে নবেম্বর বিপ্লব ও তার পরবর্তী কার্যাবলীর দ্বারা নজরুল প্রভাবিত হয়েছিল।

এখানে একটি খবর জানিয়ে রাখা ভাল। “ব্যথার দান”। গল্পটি “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা”র ছাপানোর সময়ে আমি “লাল ফৌজ” কথাটা গল্প হতে কেটে দিয়ে তার জায়গায় “মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল” কথা বসিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের দেশের পুলিশ তখন ভারতীয়দের (গল্পে হলেও) লাল ফৌজে যোগ দেওয়া কিছুতেই হজম করতে পারত না। তার ওপরে নজরুল ছিল ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সৈনিক। সম্ভবত সেনা-বিভাগও তা বরদাস্ত করত না। আজও “ব্যথার দান” পুস্তকে “মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল” কথাটা ছাপা হচ্ছে। আশাকরি এর পরবর্তী সংস্করণে (এখন অষ্টম সংস্করণ চলেছে) নজরুলের মূল পাণ্ডুলিপিতে যে ‘লাল ফৌজ’ কথাটি ছিল তা বসিয়ে দেওয়া হবে। “ব্যথার দান” পুস্তকের স্বত্বের মালিক আফজালুল হক সাহেবের দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করছি। আমি যে ‘লাল ফৌজ’ কথাটি কেটে দিয়েছিলাম তার জন্তে খুশী হয়ে নজরুল আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে-

ছিল। তার সঙ্গে আমার যে অন্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে বাড়ছিল এই জন্মে তা আরও বেড়ে গেল।

আরও একটি কথা আমি সকলকে জানানো দরকার মনে করি। “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা” এখন দুপ্রাপ্য। তাতে ছাপানো “ব্যথার দান” গল্পটি পুস্তকে ছাপানোর সময়ে নজরুলের হাতে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। গল্পের অনেক কথাই সে বাদ দিয়েছে। পুস্তকে ছাপানো গল্পের নায়ক দারার নাম “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা”র নুরুন্নবী। শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে নজরুলের পারসী শিক্ষকের নাম ছিল নুরুন্নবী। তাঁর নাম হয়তো নজরুলের পসন্দ হয়েছিল। তাই হয়তো সে তার গল্পের নায়কের নাম দিয়েছিল নুরুন্নবী। কিংবা আগে হতেই এই নামটি তার পসন্দ ছিল। “সাহিত্য পত্রিকা”র ছাপানো গল্পে নুরুন্নবী তার মার দ্বারা নুরু নামে সম্বোধিত হচ্ছে। নজরুল এই নামে সম্বোধিত হ’তে ভালোবাসত। শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী ও শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী তাকে নুরু ডাকতেন। নজরুল নিজে অনেক পত্রে নুরু নাম স্বাক্ষর করেছে। “ব্যথার দান” বইতে ছাপানোর সময়ে নুরুন্নবীর নাম দারা কেন করা হলো জানিনে। আমার মনে হয়, বেলুচিস্তানে নুরুন্নবী নাম খাপ খাবে না, এটাই সে ভেবেছিল। পক্ষান্তরে দারাও তার পসন্দসই নাম। আমার প্রথম নাতি (মেয়ের ছেলে) জন্মবার পরে নজরুল তার নাম দিয়েছে দারা। তবে, লাল ফোজের কথায় গল্পে কোনও পরিবর্তন সে করেনি।

নজরুল লিখেছিল গল্প। তা থেকে তার মনের পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু এই সময়ে ককেসাসে একটি সত্য ঘটনাও ঘটেছিল। সেই ঘটনার কথা আমি এখানে বলব।

“১৯১৮ সালের ঘটনা। ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকারীর দল ট্রান্স-ককেসাসে শিশু সোবিয়ৎ রাষ্ট্রের টুঁটি টিপে মারার জন্মে ইরান হতে সেখানে ব্রিটিশ

ফৌজের কয়েকটি ইউনিট প্রেরণ করে। এই ইউনিটগুলিতে ভারতীয় সৈন্যরাও ছিলেন। ফৌজের ভিতরে বিপ্লবী ভাবধারা যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে ব্রিটিশ সেনাদলের চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় ইউনিটগুলিতে গোলমাল ঘটে। বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্যে যে-যুগিত অভিযান চলেছিল তাতে যোগ দিতে এই সকল ভারতীয় ইউনিটের সৈন্যরা অস্বীকার করেন। তাঁদের মধ্য হতে কিছু কিছু সৈন্য ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ পর্যন্ত করেন এবং তারপরে যোগ দেন নব-গঠিত লাল ফৌজে।

“তাঁদের মধ্যে মুর্তজা আলী নামক একজন ভারতীয় সৈন্য বিশেষ ভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি নিকোলাই গিকালোর গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এই গেরিলা বাহিনীটি দাগিস্তান ও কাবাব্দী পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করছিল।

“শ্বেত-প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের বিরুদ্ধে মুর্তজা আলী অনেকগুলি যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। অবস্থা যখন নৈরাস্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যখন গেরিলা বাহিনীকে শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে এবং যখন লাল ফৌজের নিয়মিত বাহিনী হতে গেরিলা বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তখন মুর্তজা আলী অসম সাহসিকতার সহিত শ্বেত-প্রতিবিপ্লবীদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ডিপো ও যুদ্ধের মাল-মসলাগুলি ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই ভারতীয় বীরের সাহসিকতার কাজগুলি সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচারিত হয়েছিল। এই সাহসী যোদ্ধার নাম শুনলেই প্রতি-বিপ্লবীরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ত। একদিন এইরকম একটি যুদ্ধের পরে মুর্তজা আলী আর ফিরে এলেন না (reported missing)। কিন্তু তাঁর সহযোদ্ধা কমরেডরা তাঁর স্মৃতি তাঁদের মনে জীইয়ে রেখেছেন। নিকোলাই গিকালোর ভগ্নী ভেরা গিকালো ককেসাসে গেরিলা যুদ্ধের সময়ে মুর্তজা আলীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন :—‘আজকাল সোবিয়ৎ ও ভারতীয় জনগণের ভ্রাতৃত্বাত্মকতা সম্বন্ধে আমি যখন মর্মস্পর্শী

অনেক কথা পড়ি তখন আমার চিন্তাজগতে জাগরুক হয়ে ওঠে সেই নম্র, সাহসী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী যোদ্ধাদের কথা। সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, কিন্তু সাহসী মুর্তজা আলীর মতো জনগণের মুক্তির খাতিরে তাঁরাও নিজেদের জীবনের তোয়াকা রাখেন নি।

“ভারতীয় এই বোরের কাহিনী ‘ছুনিয়ার মেহনতী মানুষের পক্ষে’ (The Cause of the Working People of the World) নামক পুস্তকে বিবৃত হয়েছে। এই পুস্তকটি সম্প্রতি মস্কোতে প্রকাশিত হয়েছে।” SOVIET LAND, No. 11, June 5, 1958).

ওপরে উদ্ধৃত সত্য ঘটনার সঙ্গে নজরুলের গল্পের ঘটনার খানিকটা মিল আছে, বিশেষ করে নজরুলের দারার সাথে সত্যকার মুর্তজা আলীর মিল কম নয়। নবেম্বর বিপ্লবের খবর ও তার পরে লাল ফৌজ গঠিত হওয়ার খবর করাচির সেনা-নিবাসে পৌঁছান অসম্ভব ছিল না। সৈনিক বিভাগের অনেক সব কাগজ-পত্র সেনা-নিবাসে আসত। ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সৈনিকরা বিপুল সংখ্যাধিক্যে শিক্ষিত যুবক ছিলেন। ইংরেজি ও বাঙলা অনেক মাসিক পত্রিকার গ্রাহকও তাঁরা হয়েছিলেন। সেনা-নিবাসে দৈনিক পত্রিকা তাঁরা কিনতে পারতেন কিনা তা জানিনে, তবে না কিনতে পারলেও করাচি শহরে গেলে দৈনিক কাগজ নিশ্চয় তাঁরা পড়তে পেতেন। মোটের উপর যুদ্ধের খবর তাঁরা পেয়ে যেতেন। রুশ দেশে বিপ্লব হওয়ার ও লাল ফৌজ গঠিত হওয়ার খবরও তাঁরা পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, ককেসাসে ভারতীয় সৈন্যদের লাল ফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে অস্বীকার করার এবং কিছু কিছু ভারতীয় সৈন্যের লাল ফৌজে যোগ দেওয়ার খবর কি করাচির সেনা-নিবাসে পৌঁছুতে পেরেছিল? এই খবর কোনও সংবাদ পত্রে ছাপা হতে আমরা দেখিনি। সেনা-বিভাগের কাগজ-পত্রেও এমন খবর ছাপা হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। আশ্চর্য নয় যে শুধু নবেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার

কারণেই নজরুল তার গল্পের নায়কদের লাল ফোঁজে যোগদান
 করিয়েছিল। আজ অনুতপ্ত মনে আমায় স্বীকার করতে হচ্ছে যে এই
 ব্যাপারটি নিয়ে আমি কোনও দিন নজরুলের সঙ্গে আলোচনা করিনি।
 নজরুলও কোনও দিন এ সম্বন্ধে আমায় কিছু বলেনি। কেন যে এমনটি
 হলো কে জানে? নজরুলের জানার সম্ভাবনা কমই ছিল ধরে নিয়েও
 মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে যে সে কি ককেসাসে ভারতীয় সৈন্যের
 লাল ফোঁজে যোগ দেওয়ার খবর পেয়েছিল? হতসম্মিত নজরুল
 কোনও দিন এ প্রশ্নের জওয়াব আর আমাদের দিতে পারবে না।

আমার যতটা জানা আছে নজরুলের আগে বাঙলা দেশের, সম্ভবত
 ভারতবর্ষেরও, কোন কবি ও সাহিত্যিক রুশ বিপ্লবের পরের সোবিয়েৎ
 ভূমির কথা তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেননি। এমন আন্তর্জাতিকতার
 পরিচয়ও বিপ্লবের এক বছরের ভিতরে অণু কোনও কবি ও সাহিত্যিক
 দেননি। নজরুলের কবিতার ভিতর দিয়ে যে সাম্যবাদী সুর ফুটে
 উঠেছে তার উন্মেষ নিশ্চয় করাচির সেনা-নিবাসে হয়েছিল।

১৯২১ সালের জুন কিংবা জুলাই মাসে (বাঙলা সনের আষাঢ়
 মাস ছিল) নজরুল আমার সঙ্গে কুমিল্লা হতে কলকাতায় ফিরে
 এসেছিল সে কথা আমি আগেই বলেছি। কলকাতা আসার পরে
 কয়েকদিন সে আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে ৩২, কলেজ ষ্ট্রীটে ছিল।
 তারপর নজরুল আর আমি আবার এক সঙ্গে থাকা আরম্ভ করি।
 বাড়ীর নম্বর ছিল ৩১৪-সি (এই নম্বরটাই সঠিক) তালতলা লেন।
 মোট চার কামরার দোতলা বাড়ী ছিল। ভাড়া নিয়েছিলেন ত্রিপুরা-
 পশ্চিমগাঁওর জমীদার নওয়াব ফয়জুল্লিসা চৌধুরানীর দৌহিত্ররা। তাঁরা
 ওপরের দু'খানা ঘরে থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে কিছুদিন রিপন কলেজের
 (এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক মুআজ্জম হোসায়ন সাহেবও
 ছিলেন। আমরা তাঁদের অধীনে ভাড়াটে হয়ে নীচের দু'খানা ঘরে

ছিলেম। পরে তাঁদের দরকার হওয়ায় আমরা একখানা ঘর ছেড়ে দিয়ে শুধু দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরখানা নিয়ে থাকি। এর পরে এ ঘরখানারও চৌধুরী সাহেবদের প্রয়োজন হয়। তবে, তাঁরা এর ঠিক ওপরের ঘরখানা আমাদের ছেড়ে দেন। ৩৪-সি তালতলা লেনের বাড়ীখানা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বাড়ীর ওপরের ঘরখানাতে বসেই ১৯২১ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বোম্বে ও লাহোরেও যে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সে কথা আমি অপর একটি প্রবন্ধে অণুত্র বলেছি। পার্টি গঠনের এই প্রথম পরিকল্পনায় নজরুলও আমার সঙ্গী ছিল। অবশ্য পরে সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য কখনও হয়নি, কিন্তু বরাবর পার্টির সঙ্গে থেকেছে। ৩৪-সি তালতলা লেনের বাড়ীটি নজরুল ইসলামের নিকটও স্মরণীয়। এই বাড়ীর নীচের তলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটিতে সে তার বিখ্যাত কবিতা “বিদ্রোহী” রচনা করেছিল। সময়টা ছিল ১৯২১ সালের দুর্গা পূজার কাছাকাছি (আগের বা পরের) একটি মাস। তখনও কলকাতায় বৃষ্টি-বাদল পুরোপুরি থামেনি। রাত্রে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন নজরুল জেগে থেকে কবিতাটি লিখেছিল।

রাত্রির কতক্ষণ পর্যন্ত সে জেগেছিল তা আমি জানিনে। নজরুলকে একথা আমি কখনও জিজ্ঞাসা করিনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি যখন মুখ ধুয়ে বসেছি তখন নজরুল আমায় কবিতাটি পড়ে শোনাতে। তারও তখন ঘুম ভেঙেছিল। কোনো লোকের সামনাসামনি তার প্রশংসায় আমি উজ্জ্বল হতে পারি না। এটা আমার স্বভাবের দোষ। অবশ্য, আমার স্বভাব নজরুলের অজানা ছিল না। তবুও আমি যে কবিতাটি পড়তে শুনে উজ্জ্বল হলাম না তার জন্যে নজরুল কিঞ্চিৎ দমে গিয়েছিল। আমি তাকে কবিতাটি কোনও কাগজে পাঠানোর কথা বলেছিলেম মাত্র।

এইটুকুতে কি কোনও কবির মন খুশী হয়? তখনও কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে থমথমে ভাব চলেছে, একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়নি। তা যদি হয়ে যেতো তবে আমি কবিতাটি “প্রবাসী”তে ছাপানোর অনুরোধ নজরুলকে করতাম। কারণ “প্রবাসী”র প্রচার ছিল অনেক বেশী। বাক, পরে অনেকে এসে কবিতা পাঠ শুনেছিলেন এবং উচ্ছ্বসিতও হয়েছিলেন।

আমি আগেই বলেছি প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে আর আঘাত পেলে নজরুলের কলম দিয়ে ভালো কবিতা বের হতো। “বিদ্রোহী” যখন নজরুল রচনা করেছিল তখনও সে আলী আকবর খানের আঘাতের জ্বালা ভুলতে পারেনি। কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের পরিবেষ্টিত বন্ধনও তখন তার নিকটে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি আমাদের তখন খুব দুঃখের অবস্থা চলছিল। প্রায়ই চাল বাড়ন্ত হতো। আমরা অবশ্য বাইরের কাউকে তা জানতে দিতাম না।

আমার মাথায় দৈনিক পত্রিকা বাসা বেঁধে নিয়েছিল। ভাবতাম যে-করেই হোক দৈনিক কাগজ বাঁর করব। নজরুলেরও তাতে মত ছিল। কিন্তু টাকা আসবে কোথা হতে? ভাবলাম একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করে তার শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা প্রয়োজনীয় টাকা তুলব। কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করার জন্মেও অনেক টাকার প্রয়োজন। তার কাগজ-পত্র ছাপানোর খরচ আছে। রেজিষ্ট্রী করতে ফিস লাগবে ইত্যাদি। সে টাকাই বা কোথা হতে আসবে? কুতুবুদ্দীন আহমদ সাহেবকে দূর হতে জানতাম। তিনি এক সময়ে মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের “আল-হিলাল” ও “আল-বিলাগ” কাগজের ম্যানেজার ছিলেন। এক বন্ধু কুতুবুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে নজরুল আর আমার

পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করার ব্যয় তিনি বহন করতে রাজি আছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কথাও বললেন যে কোনও কোম্পানী রেজিষ্ট্রী না করে প্রথমে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করা ভালো। তার জন্যে কিছু টাকা তিনি দিবেন। কুতুবুদ্দীন আহমদ সাহেবের এই উপদেশ মেনে নিলে আমরা ভালো কাজ করতাম, কিন্তু আমরা জিদ করতে লাগলাম যে আমরা দৈনিক কাগজ বা'র করব। এর পরে “দি স্ট্যান্ডার্ড জনার্লিস্ লিমিটেড” নাম দিয়ে কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হয়ে গেলো। এই কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্রে কোম্পানী যে কাগজ বা'র করবে তার নীতির কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল কাগজখানা মজুর শ্রেণীর দাবী সমর্থন করবে। ইংরেজিতে এই মজুর শ্রেণী কথাটির জন্যে ‘প্রোলেটারিয়েট’ (Proletariat) কথা ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা যে ধীরে ধীরে মজুর শ্রেণীর পার্টি গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এটা ছিল তারই ইঙ্গিত। যাক কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করা হলো বটে, কিন্তু তার শেয়ার বিক্রয় হলো না। শেষ পর্যন্ত কোনও শেয়ার বিতরণ না করেই কোম্পানী তুলে দেওয়া হলো। কুতুবুদ্দীন সাহেবের অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেলো। আমাদেরও অনেক দেনা হলো।

কোনও লোক যদি কমিউনিষ্ট হতে চায় তাকে তার আগে মার্ক্সবাদী হতে হয়। অর্থাৎ মার্ক্সীয় তত্ত্ব মোটামুটি আয়ত্ত না করে কমিউনিষ্ট হওয়া যায় না! এই দিক থেকে বলা যায় যে নজরুল ইসলাম মার্ক্সীয় তত্ত্বের অধ্যয়ন কখনও ভালোরূপে করেনি। তবে, ছেলেবেলা হতে মাটির মানুষদের সঙ্গে তার যোগ ছিল। তাদের সে নিকট থেকে ও সাহচর্যের ভিতর দিয়ে বুঝেছিল।

রুশ বিপ্লবের পরে সে-দেশের কর্মকাণ্ডের কথা জানতে পেরে তার এই উপলব্ধি আরও পরিচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই থেকেই সে তার মজুরের গান ও কৃষকের গান গেয়েছে,—সে লিখেছে বহু উপ-শিরোনামে বিভক্ত তার বিখ্যাত সাম্যবাদী শীর্ষক কবিতা। মজুরদের ওপরে লেখা কিছু কিছু ইংরেজী কবিতারও সে বাঙলায় তর্জমা করেছে। তার মধ্যে সারা বিশ্বের কমিউনিষ্ট ও মজুরদের গেয় আন্তর্জাতিক সঙ্গীত একটি :

“জাগো—

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত

জগতের লাঞ্চিত ভাগ্যহত !

যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি

হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,

নব জনম লভি অভিনব ধরণী

ওরে ওই আগত ॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার

মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার !

ভেদি দৈত্য-কারা

আয় সর্বহারা

কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত ॥

কোরাস :—

নব ভিত্তি পরে

নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !

শোন্ অত্যাচারী ! শোন্‌রে সঞ্চয়ী

ছিহ্ন সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ।

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ

নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ ।

এই “অন্তর-আশ্রয়াল-সংহতি”রে

হবে নিধিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥”

বাঙলা ভাষায় আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের আরও দু'টি তরজমা হয়েছে, কিন্তু নজরুলের তরজমাটি সর্বোৎকৃষ্ট। তবে, দুঃখ এই যে নজরুল যখন এই গানটির তরজমা করেছিল তখন এর কোনও স্বরলিপি আমাদের নিকটে ছিল না। তাই, সে এই গানে সুর দিতে পারেনি। গানটি গ্রামোফোনের রেকর্ডে উঠেছে। তার সুর অবশ্য আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের সুর নয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা বিভিন্ন ভাষায় এক সঙ্গে একই সুরে গেয়ে থাকেন।

ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীত ছাড়া আরও ক'টি মজুরদের ওপরে লেখা ইংরেজি গানের বাঙলা অনুবাদ নজরুল করেছে। তার মধ্যে শেলির একটি গানের ভাবানুবাদ আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি।

এখানে নজরুলের “রক্ত-পতাকার গান”টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গানটির অনুপ্রেরণাও সে কোনও একটি ইংরেজি গান হ'তে পেয়েছিল :—

“ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !

দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা

ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান !

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

শীতের শ্বাসেরে বিজ্রপ করি ফুটে কুসুম,

নব-বসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,

অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরেরে হান মৃত্যু-বাণ।

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

চির-বসন্ত ঘোঁষন করে ধরা শাসন,

নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বদ্ধ মন,

ওড়াও তবে রে লাল নিশান

ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান ।

বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও উদ্দেশ',

গাহরে গান

লাল নিশান ! লাল নিশান !

“গণবাণী”, ২৮শে এপ্রিল, ১৯২৭

তা ছাড়া, মজুর-কৃষক, এক কথায় নিপীড়িত মানুষের ওপরে নজরুল
নিজে অনেক গান ও কবিতা রচনা করেছে। ১৯২৬ সালে ব্রিটেনে যে
সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল তার ওপরেও সে একটি কবিতা রচনা
করেছে।

যুদ্ধের সময়ে চিয়াং কাইসেক যখন ভারতে এসেছিলেন তখন
তঁার বন্দনায় একটি গান রচনার জগ্বে গ্রামোফোন কোম্পানীর
তরফ হতে নজরুলকে অনুরোধ করা হয়েছিল। আজ যে ছুরারোগ্য
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নজরুল হতবাক ও হত-সম্মিৎ হয়েছে সে-
ব্যাধির আক্রমণ তখন তার শরীরে শুরু হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও
নজরুল গান রচনা করেছিল এবং এই গানটি চিয়াং কাইসেকের বন্দনা
নয়। যিনিই গানটি পড়বেন তিনি বুঝতে পারবেন যে তা আসলে
চীন ও ভারতের নিপীড়িত মানুষের বন্দনা। এটি নজরুলের লেখা
শেষতম গান কিনা তা বলা শক্ত, তবে তার শেষ লেখাগুলির মধ্যে এই
গানটি যে অগ্ন্যতম তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পুরো গানটিই আমি
এখানে তুলে দিচ্ছি :—

“চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।

চীন ভারতের জয় হোক ! ঐক্যের জয় হোক ! সাম্যের জয় হোক !

ধরার অর্ধ নর-নারী মোরা রহি এই দুই দেশে,

কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে,

সহিব না আর এই অবিচার, খুলিয়াছে আজি চোখ ॥

চীন ভারতের জয় হোক ! ঐক্যের জয় হোক ! সাম্যের জয় হোক !

প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়

(আজ) এই কথা যেন কয়—

মোরা সভ্যতা শিখিয়েছি পৃথিবীতে

ইহা কি সত্য নয় ?

হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল,

সুন্দর হবে, শান্তি লাভিবে, নিপীড়িতা ধরাতল !

আমরা আনিব অভেদ ধর্ম নব বেদগাথা শ্লোক ॥

চীন ভারতের জয় হোক ! ঐক্যের জয় হোক ! সাম্যের জয় হোক ! ”

নজরুল ইসলামের আকাঙ্ক্ষা আজ চীন দেশে রূপায়িত হয়েছে। সে-
দেশের ‘সর্বহারার দল’ আজ ‘সর্বজয়ী’। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিত্র গ্রামোফোন
কোম্পানীর রেকর্ডে নজরুলের এই গানটি গেয়েছেন।

“ধূমকেতু”র প্রকাশ

“ধূমকেতু” প্রকাশের পেছনে একটি ছোট ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে আমি হয়ত অনেকের দ্বৈধ নফ্ট করব। কিন্তু কবি নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত যাঁরা রচনা করবেন তাঁদের তথ্য পরিবেশন করাই যখন আমার কাজ তখন আমি যা জানি তা আমায় বলতেই হবে। এই সব তথ্যের কতটুকু ব্যবহার করা হবে, আর কতটুকু করা হবে না, তা জীবনচরিত রচয়িতারা বুঝবেন।

হাফিজ মসুদ আহমদ নামক একজন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তবে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখা হতো। চাটগাঁ জেলায় তাঁর বাড়ী ছিল, আর তিনি পড়াশোনা করেছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসায়। তাঁর ওপরে আমার শ্রদ্ধা ও বিরাগ দুই-ই ছিল। উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় অবস্থিত দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়েছিলেন বলে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। মুসলিম ধর্মশাস্ত্র পড়ানোর ভিতর দিয়ে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ছাত্রদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী করে তোলার চেষ্টা করা হতো। তাঁর উপরে আমার বিরাগের কারণ ছিল এই যে মাতৃভাষা বাংলায় কথা না বলে তিনি হামিশা উর্দুতেই কথা বলতেন। আসলে তিনি বাংলা স্কুলে কখনও পড়েন নি। তাঁর পাঠ্যজীবন শুরু হয়েছিল মাদ্রাসায়। সেকালে মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের অবস্থা ছিল এই রকম।

১৯২২ সালের প্রথম ভাগে এই হাফিজ মসুদ আহমদ আমার নিকটে একখানা বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বাঁর করার প্রস্তাব নিয়ে এলেন এবং ভূতের মুখে রাম নামের মতো তিনি আমার সঙ্গে

বাঙলাতেই কথা বললেন। যদিও তিনি ‘সমস্ভা’কে ‘সমিস্যা’ বলছিলেন তবুও তাঁকে বাঙলা বলতে শুনে আমি খুশী হয়েছিলাম। টাকার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন যে ‘আড়াই শ’ টাকা জোগাড় হয়েছে। মাত্র ‘আড়াই শ’ টাকা হাতে নিয়ে কাগজ বা’র করতে যাওয়া ধ্বংসাত্মক হবে ভেবে আমি তাঁর প্রস্তাব তখনই নাকচ করে দিলাম।

১৯২২ সালের প্রথম ভাগে নজরুল ইসলাম বেশ কিছুকাল কুমিল্লায় ছিল। সেই সময়ে সে কলকাতার দৈনিক “সেবকে”র নিকট হতে একখানা পত্র পায়। তাতে অনুরোধ ছিল যে কলকাতায় এসে নজরুল ইসলাম যদি “সেবকে” লেখা শুরু করেন তবে তাঁরা বাধিত হবেন। দৈনিক “সেবকে” মাওলানা মুহম্মদ আকরম খানের কাগজ ছিল। মাওলানা সাহেব তখন জেলে ছিলেন। নজরুল ইসলাম কলকাতায় ফিরে এসে কাগজে কাজ শুরু করে দিল। আমার নিকট হতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মসুদ আহমদ তাঁর সাপ্তাহিক কাগজের প্রস্তাব নিয়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করলেন এবং নজরুলকেও ‘আড়াই শ’ টাকা জোগাড় হওয়ার কথাই তিনি বললেন। আশ্চর্য এই যে সঙ্গে সঙ্গেই সে রাজি হয়ে গেল।

নজরুল কাগজ বের করবার সব ব্যবস্থা করে ফেলল। স্থির করল কাগজের নাম হবে “ধূমকেতু”। ৩২, কলেজ ষ্ট্রীট, আফজালুল হক সাহেবের ঘরে অফিস স্থাপিত হলো। ছাপানোর ব্যবস্থা হলো মেটকাফ প্রেসে। মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে আফজালুল হক সাহেব চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হতে অনুমতি নিলেন। ১৩২৯ সালের শ্রাবন মাসে “ধূমকেতু” “হুণ্ডায় ছু’বার দেখা দেবে”র ঘোষণা নিয়ে বা’র হলো। ক্রাউন ফলিও (১৫” × ১০”) সাইজের আট পৃষ্ঠার কাগজ, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক আনা এবং বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা। সারথি—কাজী নজরুল ইসলাম। কাগজের ম্যানেজার বা বা কর্মসচিব হলো শ্রীশান্তিপদ সিংহ।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ভুল করতে পারেন, (“কল্লোল যুগ”, ৪৬পৃঃ) তিনি সবে নজরুলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন। কিন্তু পবিত্রকে (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) ভুল করতে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। সেও লিখেছে “ধূমকেতু” ফুলস্ক্যাপ চার পাতার সাপ্তাহিক কাগজ ছিল, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছিল এক পয়সা। (‘কবি নজরুল’ ৩৫ পৃঃ)। ফুলস্ক্যাপ চার পাতা বলতে বোধ হয় সে ফুলস্ক্যাপ ফলিউ চার পৃষ্ঠা মনে করেছে। স্মৃতি যে মানুষকে কত বিভ্রান্ত করতে পারে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। একেবারে সব কিছু ভুল। এই রকম সব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার ফলে অশক্ত শরীর নিয়েও আমায় “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে” গিয়ে “ধূমকেতু”র পুরানো সংখ্যাগুলি দেখে আসতে হয়েছে।

কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার নেবুতলার ওখানে একটি হাইস্কুলে হেড মাস্টারের কাজ করার সময় তাঁর দু’জন ছাত্রকে তিনি নজরুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের একজনের নাম শ্রীশান্তিপদ সিংহ ও আর একজনের নাম নির্মল সেন। এই দু’জন ছাত্র নজরুলের তো বটেই, আমারও স্নেহের পাত্র হয়ে পড়ে। শাঁখারীটোলার কাছাকাছি যত্ন শ্রীমানীর লেনে নির্মল রাখত। শাঁখারীটোলার পোস্ট মাস্টারের খুনের পরে বরেন ঘোষ যখন ওই গলির পথে দৌড়ে পালাচ্ছিলেন তখন এই নির্মলই তাঁর পায়ের ভিতরে পা গলিয়ে দিয়ে তাঁকে ফেলে দেয়। তাইতে তিনি ধরা পড়ে যান। বরেন ঘোষ কোনও রাজনীতিক ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ইত্যাদি বেচারী নির্মল কিছুই জানত না। সে ভেবেছিল কোনও চোরকে লোকেরা তাড়া করছে। ভারত সরকারের সার্ভে বিভাগে সে চাকরি নিয়েছিল। সে ভালো আঁকতে জানত। তার চাকরী যখন হয় তখন সে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল। চাকরীতে সে বড় অফিসারের পদেও উঠেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মিক ক্ষত রোগে সে মারা যায়।

শাস্তিপদ সিংহ নজরুলের সংস্রবে দীর্ঘকাল ছিল। ১৯২৯ সালে সে নজরুলদের সঙ্গে পানবাগান লেনে এক বাড়ীতে থেকেছে। হাঁ, মসুদ আহমদ শেষ পর্যন্ত পুরো আড়াই শ' টাকাও নজরুলকে দিতে পারেনি। পরে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে সে পুলিশের দ্বারা নিয়োজিত লোক ছিল। আমি যদি কখনও আমার পার্টি জীবনের স্মৃতিকথা লিখি তবে মসুদ আহমদের কথা বিস্তৃতভাবে বলব।

“ধূমকেতু”কে লেখা দিয়ে ও অন্ত্যভাবে (অবশ্য অর্থ দিয়ে নয়) সাহায্য করার জন্তু অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন। শ্রীভূপতি মজুমদারের (এখন পশ্চিম বাঙলার মন্ত্রী) নাম এই সংস্রবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পরিচালনার অনেকটা ভার নিয়েছিলেন। অনেক দিন তিনি “ধূমকেতু” আফিসেই রাত্রিবাস করতেন। বাকেরগঞ্জ জিলার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামও এই সূত্রে উল্লেখনীয়। তিনি “ধূমকেতু”তে লিখতেন। পরে তিনি ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়াতে যোগ দিয়েছিলেন। আরও অনেকে “ধূমকেতু”তে লেখা ছাপাতেন। তাঁদের মধ্যে যার স্মৃতি আমার মানস-পটে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত হয়ে আছে তার নাম শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নৃপেন তখন ছেলেমানুষ ছিল, যতটা মনে পড়ে আই-এ ক্লাসে পড়ত। কিন্তু তার অনেক কিছু পড়াশুনা ছিল। সে লিখতেও পারত খুব ভালো। রাজনীতিতেও তার আকর্ষণ ছিল। “ধূমকেতু”তে সে ম্যাটাসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের জীবনের নানান দিক নিয়ে লিখত। “ধূমকেতু” চালাতে গিয়ে নজরুল অনেকেই পেয়েছিল। নৃপেন ছিল তার একটি শ্রেষ্ঠ পাওয়া। সে তার ব্যবহারের গুণে অতি সহজে সকলের আপন জন হয়ে যেতে পারত। নৃপেনকে আমিও স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতাম,—শ্রদ্ধা তার অনেক কিছু জ্ঞান-শোনার জন্তু। ছোটদেরও আপনি সম্বোধন করা আমার অভ্যাস, কিন্তু নৃপেন আমাকে দিয়ে ‘তুমি’ বলিয়ে ছেড়েছিল। সে

এখন একজন কৃতী লেখক। দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পেষিত না হলে সে আরও অনেক বড় হতে পারত।

শ্রমজীবী জনগণের প্রতি নজরুলের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শুরু হতেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। তার গল্পের নায়কেরা লাল-ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। দৈনিক ‘নবযুগ’-এ সে মজুর-কৃষকের ওপরে প্রবন্ধ লিখেছে। ‘যুগবাণী’ নামক পুস্তকের ‘ধর্মঘট’ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। তথাকথিত ভদ্রলোকেরা যে তথাকথিত ছোটলোকদের ওপরে অত্যাচার করে, তাদের ঘৃণা ও উপেক্ষা করে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নজরুল দৈনিক ‘নবযুগ’-এ ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ শিরোনাম দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে। এই প্রবন্ধটিও ‘যুগবাণী’ নামক পুস্তকে সম্মিলিত হয়েছে। ‘ধূমকেতু’ চালাবার সময়েও সে কবিতায় ‘লাল’-এর আরাধনা করেছে, সে বলেছে ‘জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন’। এই সব কিছু সত্ত্বেও ‘ধূমকেতু’তে তার আবেদন ছিল মূলত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের প্রতি। অসহযোগ আন্দোলনের কারণে বাঙলা দেশের সম্ভ্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন তখন চাপা পড়ে গিয়েছিল। ‘ধূমকেতু’তে নজরুলের লেখা পড়লে মনে হতো সে সেই আন্দোলনেরই পুনরাবির্ভাবের আহ্বান জানাচ্ছে। ১৯২২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের ‘ধূমকেতু’তে ‘বিষ-বাণী’ শীর্ষক প্রবন্ধে সে লিখেছিলঃ—

“মাঠে! মাঠে!! ভয় নাই, ভয় নাই—ওগো আমার বিষ-মুখ অগ্নি-নাগ-নাগিনী পুঞ্জ! দোলা দাও, দোলা দাও তোমাদের কুটিল কণায়। তোমাদের যুগ যুগ সঞ্চিত কাল-বিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ফেল। তোমাদের বিভূতিবরণ অঙ্গ কাঁচা বিষের গাঢ় সবুজ রাগে রেঙে উঠুক। বিষ সঞ্চয় কর, বিষ সঞ্চয় কর—হে আমার তিক্ত-চিত্ত ভুজগ তরুণ দল! তোমাদের ধরবে কে? মারবে কে? যে ধরতে আসবে, তার হাড় মাংস খসে পড়বে উগ্র ‘বিষের দাহনে।—’ অবশ্য, ‘ধূমকেতু’র পথ যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পথ এ

কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে নজরুল কখনও ভোলেনি। ১৩২৯ সালের ২৬শে আশ্বিন তারিখের “ধুমকেতু”তে সে লিখেছিল :— “প্রথম সংখ্যার “ধুমকেতু”তে “সারথির পথের খবর” প্রবন্ধে একটু আভাষ দিবার চেষ্টা করেছিলাম, যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে ওঠেনি মনের চপলতার জঘ। আজও হয়ত নিজেকে যেমনটি চাই তেমনটি প্রকাশ করতে পারব না, তবে এই প্রকাশের পীড়ার থেকেই আমার বলতে-না-পারা বাণী অনেকেই বুঝে নেবেন—আশা করি।

* * * *

“সর্বপ্রথম “ধুমকেতু” ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

“স্বরাজ্য টরাজ বুঝি না, কেন না, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু স্ববুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।” খ্রীষ্টীয় হিসাবে ১৩২৯ সালের ২৬শে আশ্বিন ছিল ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর। এর কয়েক মাস আগে, অর্থাৎ ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মাওলানা হসরৎ মোহানী কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। গান্ধীজীর কঠোর বিরোধিতায় ভোট পরাজিত হলেও এই প্রস্তাব উত্থাপন করার অপরাধে আদালতে মাওলানা হসরৎ মোহানীর বিচার হয়েছিল এবং

তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই কঠোর বিচারের নজীর সামনে থাকা সত্ত্বেও নজরুলের দৃপ্ত ঘোষণা লক্ষণীয়। এমন খোলাখুলিভাবে সংবাদ পত্রের স্তম্ভে বাঙলা দেশে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা এর আগে আর কেউ করেন নি।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের বড় আকর্ষণ ছিল। আমার মনে হয় বিপ্লবী শ্রীনিবারণ ঘটকের সাহচর্য হতে নজরুলের ভিতরে এই আকর্ষণের সূচনা হয়েছিল। নজরুল আমায় বলেছিল কোনও এক স্কুলে শ্রীঘটক তার শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের নাম আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। শ্রীঘটক আজো জীবিত আছেন এবং শুনেছি তিনি বীরভূম জিলায় থাকেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই স্কুলের নাম জানা সম্ভব। তাঁর আসল বাড়ী রানীগঞ্জের শিয়ারশোলে। নজরুল সবচেয়ে বেশীদিন শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়েছে। এই স্কুলেই কি শ্রীঘটক তার শিক্ষক ছিলেন?

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন চাপা পড়ে গিয়েছিল। “ধূমকেতু”তে নজরুলের লেখার ফলে সে-আন্দোলন যে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল একথা বললে ভুল বলা হবে না। তবে, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের মাথা তোলার পেছনে অগ্নি কারণও যে ছিল না তা নয়। সন্ত্রাসবাদী দাদাদের অনেকেই “ধূমকেতু” আফিসে এসে নজরুলের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছিলেন। শ্রী ভূপতি মজুমদার যে ওখানেই বাসা বেঁধেছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি। যুগান্তরের কোন কোন গ্রুপ “ধূমকেতু”কে তাঁদের পার্টির কাগজ বলেও প্রচার করতেন! অনুশীলন দলের শ্রীঅতীন রায় চৌধুরী “ধূমকেতু”কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু নজরুলের “আনন্দময়ীর আগমনে” ছাপা হওয়ার পরে অনুশীলন দলের অনেকে নজরুলের উপরে চটে গিয়েছিলেন। ‘বুড়ি গঙ্গার পুলিন বুক বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু-রাজার’ ছত্রটি তাঁরা হজম করতে পারেন নি।

শ্রীপুলিন দাস অনুশীলন দলের মহত্তম নেতা ছিলেন।

“ধূমকেতুর” সঙ্গে আমার কোনও সাংগঠনিক যোগ ছিল না। তার মানে, তার পরিচালনায় ও নীতি নির্ধারণে আমার কোনও হাত ছিল না। আমি অবশ্য হামিশা “ধূমকেতু” আফিসে যেতাম, অনেক সময়ে রাতে সেখানে বাসও করতাম। নজরুল যে শুধুই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নিকট তার আবেদন জানাচ্ছিল তার একটা উষ্টো প্রতিক্রিয়া আমার ভিতরে হয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে ‘দৈপায়ন’ ছদ্মনামে কাগজে লিখতাম। আমার জন্মস্থান একটি দ্বীপ। তাই থেকে এই নামটি আমি গ্রহণ করেছিলাম। ‘দৈপায়নের পত্র’ শিরোনাম দিয়ে আমি একখানা পত্র “ধূমকেতু”তে ছাপাবার জন্ম দিয়েছিলাম। ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের “ধূমকেতু”তে তা ছাপা হয়েছিল। পত্রখানা নীচে তুলে দিলাম :—

‘ভাই সারথি,

তোমার “ধূমকেতু” আমি রীতিমত পড়ছি, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে যে জিনিসটি চাইছি সেইটিই ওতে আমি পরিস্ফুটরূপে পাচ্ছি। আমাদের দেশের জনমণ্ডলীর প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে, তোমার লেখাতেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বড় দুঃখ যে তুমি তাদের বিষয়ে পরিস্কার করে আজো কিছু বলনি। নির্ধাতিত জনসাধারণ বলতে আমি আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিক-দিগকেই বুঝি। এরা ছাড়া আর সবাই নির্যাতনকারী, নির্ধাতিত নয়। আমাদের বেশীর ভাগ কাগজই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা লিখছে। আর কাঁছনিও তারা গাইছে তাদের আপনাদেরই জন্ম। এই সেদিনও ‘সনাতন’ নামে একখানা কাগজ মধ্যশ্রেণীর বাঙালীর জন্মে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাজারে বা’র হয়েছে। কিন্তু, এই মধ্য শ্রেণীর লোকেরা কি কম অত্যাচারী? দেশের দাসত্বের নিগড়কে হুদুচ করার জন্ম যতটা দায়ী জমীদার ও ধনী লোকেরা, তার চাইতে এতটুকুও কম দায়ী নয়

এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা। আমাদের মরা-বাঁচা সমূহ নির্ভর করছে কৃষক ও শ্রমিকদের উপরে। কৃষকরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে আমাদের খাদ্য দ্রব্য তৈরি করে দিলে তবে আমরা খেয়ে বাঁচি, আর মজুরেরা কারখানায় খেটে ব্যবহার্য নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে দিলে তবেই সকলের সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সৈন্য সংগ্রহও করা হয়ে থাকে এই দু' শ্রেণীরই লোকের মধ্য থেকে। সংখ্যায়ও ওরা বেশী, বোধহয় শতকরা ৮০ জনেরও উপরে। মোট কথা, এই যে দুনিয়ারূপ মেশিনটা চলছে এটার সমস্ত কল-কজাই কৃষক-মজুরদের হাতে। ওরা চালালে তবে এ মেশিন চলবে, আর না চালালে এক দিনেই বন্ধ হয়ে যাবে।

“এমন যে কৃষক ও শ্রমিক, ওদেরকে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা মেরে রেখে দিয়েছে, শুধু ভাতের দিক দিয়ে নয়, মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও। এ অত্যাচারীরা নানা দিক থেকে, নানাভাবে অত্যাচার করেও গরীবদের আর কিছু রাখেনি। সব কিছু যারা করছে তাদেরকেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা কিছুই নয়। কর্মের সম্মান আমরা করতে জানিনে। তা যদি জানতেম তা হলে এত দুর্দশা আমাদের কস্মিনকালেও হত না। যে যত অলস, সে-ই তত বেশী ভদ্রলোক আমাদের এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে, আর যারা কাজের লোক তারাই সব ছোট লোক। চাষা আর মজুর শব্দই এ দেশের ভাষায় গালি !!

“কৃষক ও শ্রমিকের কথা কখনও ভেবেছ কি? একটা কথা সোজা তোমায় বলে দিচ্ছি, যদি তাদের কথা ভাবতে না শেখ তা হলে তোমাকে দিয়ে দেশের কোন সেবাই হবে না, প্রাণ দিলেও না। ওরাই দেশের শক্তি। ওদেরকে না জাগালে, আত্মবোধ না শেখালে তোমার তথাকথিত ‘ভদ্র লোকেরা’ কিছুই করতে পারবে না, কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। তারা জানে শুধু কৃষক ও শ্রমিকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে। পেটের জ্বালায় ধনীর ঘরে যে সিঁধ কাটতে যায় সে চোর, সমাজে তার

স্থান নেই, আর যুগ-যুগান্তর ধরে কৃষকের মুখের গ্রাস বারি কেড়ে
খাচ্ছে তারাই ভদ্রলোক, সমাজপতি। শস্যের জন্মদাতা হয়েও
কৃষকেরা অনাহারে মারা যাচ্ছে। ধনীরা কল-কারখানাতে প্রচুর লাভ
করছে, অথচ শ্রমজীবীরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে না পেয়ে রক্ত বমি
করে মরছে। কেন এমন হয় সামান্য চিন্তাতেই তা বুঝতে পারবে।
চিন্তার হাটে দেউলিয়া হয়েই ত আমরা দেশের সর্বনাশ করছি।”

১৯২২ সালের ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁদের
ধারণা ছিল যে দেশের মুক্তি শুধু তাঁরাই আনতে পারবেন, আর মজুর
ও কৃষকেরা গড্ডলিকা প্রবাহের মতো তাঁদের অনুসরণ করবেন। যাঁরা
রাজনীতি করতেন না তাঁরা তো মজুর-কৃষকের নাম শুনেই নাক
সিঁটকাতেন। আজ অবস্থায় বিপুল পরিবর্তন এসেছে। ভদ্রলোকেরা
এখন মজুরে পরিণত হচ্ছেন। নজরুল ইসলামের চেতনায়ও পরিবর্তন
এসেছিল। ১৯২২ সালের পরে মজুর, কৃষক ও জনগণকে বাদ দিয়ে
নজরুলকে কল্পনা করাই যেত না।

আমার উপরে তুলে-দেওয়া পত্রখানার ওপরে ‘এক’ লেখা আছে।
তার মানে পরে আরও পত্র লেখার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু সত্যি
আমার আরও পত্র ছাপা হয়েছিল কিনা তা আমার মনে পড়ছে না।
‘ধূমকেতু’র সব সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

৩২, কলেজ স্ট্রীটের বাড়ী হতে “ধূমকেতু” কয়েকদিন বা’র
করার পরে বাড়ীর মালিকদের একজন (তিনি উকীল ছিলেন)
রাগে গরগর করতে করতে এসে জানালেন যে তাঁদের বাড়ী
হতে “ধূমকেতু” বা’র করা চলবে না। তাঁরা বড় ভয় পেয়ে
গিয়েছিলেন। “ধূমকেতু” আফিসের জন্তে নজরুল আগে হতেই
জায়গা খুঁজছিল, জায়গা পাওয়াও গেল সাত নম্বর প্রতাপ চাটজোর
লেনের দোতালায়। সেখানেই “ধূমকেতু” আফিস উঠে গেল।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ—

“জাগিয়ে দেব চমক মেরে

আছে যারা অর্ধচেতন !”

“ধূমকেতু”তে ফলেছিল। তাতে নজরুলের লেখা পড়ে বাঙলার শিক্ষিত যুবকরা সত্যি চমকে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও বেঙ্গল পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, আর আলোড়ন শুরু হয়েছিল বাঙলা সরকারের বিচার বিভাগেও। সার আবদুর রহীম তখন ছিলেন বাঙলার গবর্ণরের একজেকিউটিব কাউন্সিলে বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেম্বর। তিনি নাকি মত দিলেন যে “ধূমকেতু”র বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হওয়া উচিত। পুলিশ নাকি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে বুঝতে চেয়েছিল, কা’রা রয়েছে “ধূমকেতু”র পেছনে। কিন্তু সার আবদুর রহীম জিদ করায় মোকদ্দমা রুজু করাই স্থির হয়ে গেল। এসব এর-ওর মুখে শোনা কথা। তথ্য হিসাবে সঠিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। ক’দিন ধরে কেবলই গুজব রটতে লাগল নজরুলের বিরুদ্ধে গিরেফতারি পরওয়ানা বাঁ’র হবে। বন্ধুদের অনেকে বললেন নজরুল কিছুদিন সরে থাকলে ভালো হয়। আমি বললাম “তুমি যদি সরেই থাকতে চাও তবে চেষ্টা করে দেখা যাক তোমায় ‘মস্কো পাঠানো যায় কিনা।’ কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালে ভারতীয় ব্যাপারের যাঁরা চার্জে ছিলেন নজরুলের লেখার সংগ্রামশীলতা তাঁদের আকর্ষণ করেছিল। তাঁরাই জানিয়েছিলেন নজরুলকে একবার পাঠাতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু সে তেমন গা-ঢাকাও দিল না, আবার কলকাতার বাইরেও চলে গেল। প্রথমে সে গেল সমস্তিপুরে। সেখানে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী সকল্য তাঁর ভাইদের বাড়ীতে ছিলেন। সমস্তিপুর হতে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে নজরুল চলে গেল কুমিল্লায়।

একদিন (৮ই নবেম্বর, ১৯২২) খুব সকাল বেলা আবদুল হালীম আর আমি “ধূমকেতু” আফিসে গিয়ে দেখলাম শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (বাকেরগঞ্জ জিলার) সেখানে “ধূমকেতু”র জন্যে লিখছেন। আমাদের পৌঁছুবার পরক্ষণেই পুলিশ তলাশি করতে এসে গেল। তখন চারিদিকে চেয়ে দেখলাম শ্রীবীরেন সেন কোথাও নেই। তলাশি শুরু হলো। পরওয়ানায় দেখা গেল “ধূমকেতু”র দু’টি লেখা বাজয়াফ্ত হয়েছে। একটি “আনন্দময়ীর আগমনে” শীর্ষক নজরুলের একটি কবিতা, অন্যটি “বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ” শীর্ষক একটি ছোট মেয়ের একটি লেখা। পুলিশ নজরুলেরও খোঁজ করল। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের) ১২৪-ক ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অপরাধে গিরেফতারি পরওয়ানা ছিল। আমরা জানালাম নজরুল কলকাতার বাইরে গেছে। পুলিশ বাজয়াফ্ত হওয়া কাগজ নিয়ে চলে গেল। তারপরে আমরা দেখলাম সাত নম্বরের বাড়ীর সংলগ্ন মেডিকাল ছাত্রদের বোর্ডিং হাউস হতে শ্রীবীরেন সেন হাসতে হাসতে বের হয়ে আসছেন।

“ধূমকেতু”তে প্রকাশিত নজরুলের অনেক লেখার জন্যেই তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হতে পারত। কিন্তু মোকদ্দমা হলো “আনন্দময়ীর আগমনী”কে নিয়ে। এই কবিতাটি “আনন্দবাজার পত্রিকা”র পূজা সংখ্যার জন্যে লিখিত হয়েছিল। আনন্দবাজারের তখনকার দিনের অন্যতম মালিক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ (তিনি “অমৃতবাজার পত্রিকা”র মালিকদেরও একজন ছিলেন) নজরুলকে স্নেহ করতেন। তাঁরই অনুরোধে সে কবিতাটি লিখেছিল। কেন জানিনে, শেষ পর্যন্ত সে কবিতাটি “ধূমকেতু”তেই ছেপে দিল। কবিতাটি নজরুলের কোনও পুস্তকে ছাপা হয়নি। “ধূমকেতু”ও পাওয়া যায় না, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কয়েক সংখ্যা মাত্র আছে। তা থেকে নকল করে নিয়ে

পুরো কবিতাটিই এখানে ছাপানো হলো। কবিতাটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত।

“আনন্দময়ীর আগমনে”

“আর কতকাল থাকবি বেটা মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল ।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী ?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে রূপাণ ধরে ?
বিষ্ণু নিজের বন্দী আজি ছয়-বছরী কন্দি-কারায়,
চক্র তাঁহার চরকা বুঝি ভঙ-হাতে শক্তি হারায় ।
মহেশ্বর আজ সিন্ধুতীরে যোগাসনে মগ্ন ধ্যানে
অরবিন্দ চিত্ত তাঁহার ফুটবে কখন কে সে জানে !
সত্ত্ব অম্বর-গ্রাসচ্যুত ব্রহ্মা চিত্তরঞ্জনে হায়
কমণ্ডলুর শান্তি-বারি সিঞ্চি যেন চাঁদ নদীয়ায় ।
শান্তি শুনে তিত্ত এ মন কাঁদছে আরো ক্ষিপ্ত রবে,
মরার দেশের মড়া-শান্তি, সেত আছেই, কাজ কি তবে
শান্তি কোথায় ? শান্তি কোথায় কেউ জানিনা
মাগো তোর ঐ দল্লজ-দলন সংহারিণী মূর্তি বিনা !
দেবতারা আজ জ্যোতিহারী ধ্রুব তাঁদের যায়না জানা,
কেউ বা দৈব-অন্ধ মাগো কেউ বা ভয়ে দিনে কানা ।
সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন দানব রাজার অত্যাচারে,
দম্ভ তাঁহার দস্তোলি ভীম বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে ।
রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধ কারার বন্ধ ঘরে ।
গগন-পথে রবি-রথের সাত সারথি হাঁকায় ঘোড়া,
মর্তে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া ।

বারি-ইল্ল বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,
 বুড়ি-গন্ধার পুলিন বৃকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু-রাজায় ।
 পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বরুশ করায় দানব-জুতো
 মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডাঙা-গুঁতো ।
 দাড়ি নাড়ে, কতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
 নাইক খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এসব বন্দী-গড়ে ।
 'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে
 ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে
 তাজ-হারা যার নাকশিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি
 ধর্ম-কথা বলছে তারাই পড়ছে তারাই কেতাব পুঁথি ।
 উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি,
 হিজরে ভীরুর ধর্ম-কথার ভণ্ডামিতে আসছে বমি !
 টিকটিকির ঐ ল্যাজুর সম দিগ্ধদিকে উড়ছে টিকি,
 দেবতার আগে পূজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি !
 পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগ্‌লি খেয়ে ভরায় উদর
 টিকটিকি হয়, বিষ্ঠা কি নাই—ছি ছি এদের খাও ক্ষুধার !
 আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
 লাথি খায় আর চ্যাচায় শুধু, 'দোহাই হজুর মলাম মলাম' ।
 মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি নাকি
 খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি ।
 হান্ তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
 মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ রক্ত দে মা রক্ত দেখা !
 লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তোর আয় মা রেখে কমল-বনে,
 বুদ্ধি-বুড়ো সিদ্ধিদাতা গণেশ-টনেশ চাই না রণে ।
 ঘোমটা-পর্য কলা বোঁ-এর গলা ধরে দাও করে দূর,
 ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি, ময়ূর-চড়া জামাই ঠাকুর ?
 দূর করে দে, দূর করে দে এসব বালাই সর্বনাশী,
 চাই নাক ঐ ভাং-খাওয়া শিব, নেক নিয়ে তাঁয় গঙ্গা মাসী ।

তুই একা আয় পাগলী বেটী তাইথে তাইথে নৃত্য করে,
 রক্ত-তুষার 'ময় ভূখা হুঁ'র কাদন-কেতন কণ্ঠে ধরে
 'ময় ভূখা হুঁ'র রক্ত ক্ষেপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী,
 গুরুর বাগে শিখ সেনা তোর হুকারে ঐ 'জয় আকালী' ।
 এখনো তোর মাটির গড়া যুগ্মী ঐ মূর্তি হেরি,
 হু চোখ পুরে জল আসে মা, আর কত কাল করবি দেবী ?
 মহিষাসুর বধ করে তুই ভেবেছিলি রইবি সুখে,
 পারিস্ নি তা, ত্রেতা যুগে টল্‌ল আসন রামের দুখে ।
 আর এলিনে রুদ্রাণী তুই জানিনে কেউ ডাকল কিনা,
 রাজপুতনায় বাজল হঠাৎ 'ময় ভূখা হুঁ'র রক্ত বীণা ।
 বৃথাই গেল সিরাজ টিপু মীর কাসিমের প্রাণ বলিদান,
 চণ্ডী ! নিলি যোগমায়া-রূপ, বলল সবাই বিধির বিধান ।
 হঠাৎ কখন উঠল ক্ষেপে বিদ্রোহিনী বাম্বি-রানী,
 ক্ষাপা মেয়ের অভিমানেও এলিনে তুই মা ভবানী ।
 এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কতকাল নিবি পূজা ?
 পাষণ বাপের পাষণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভূজা ।
 বছর বছর এ অভিনয়-অপমান তোর, পূজা নয় এ,
 কি দিস আশীষ কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে ।
 অনেক পাঠা-মোষ খেয়েছিস, রাফসী তোর যায়নি ক্ষুধা, ।
 আয় পাষণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা
 দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীকর এ হীন শক্তি পূজা
 দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভূজা
 সেইদিন জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
 বাজবে বোধন-বাজনা সেদিন গাইব নব জাগরণী ।
 'ময় ভূখা হুঁ' মারি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
 কৈলাস হতে গিরি-রানীর মা-তুলালী কন্যা অয়ি !
 আয় উমা আনন্দময়ী ।

(ধুমকেতু, ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২)

নজরুলের নামে গিরেফতারি পরওয়ানা বের হওয়ার পর হতে পুলিশ তাকে খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে কুমিল্লা হতে গিরেফতার করে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো! বিচারাধীন বন্দী হিসাবে সে কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে ছিল। তার বিচার হয়েছিল কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিন্টার স্ত্রইনহোর আদালতে। বিচারের সময় নজরুল আদালতে যে বিবৃতি দিয়েছিল তা আমাদের সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। “রাজবন্দীর জবানবন্দী” নাম দিয়ে এই বিবৃতির হাজার হাজার খানা বিক্রয় হয়ে গেছে। তাই তার কোন অংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করলাম না।

১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে মিন্টার স্ত্রইনহো মোকদ্দমার রায় শোনালেন। রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুল ইসলাম এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। রায় শোনানোর সময় আমরা অনেকেই আদালতে উপস্থিত ছিলাম। একজন অল্প বয়স্ক উকীল দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করলেন যে কবিকে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য করার জন্যে সুপারিশ করা হোক। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। রাজনীতিক বন্দী মাত্রকেই তো বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে তাই হয়ে আসছিল। তখনকার দিনে বিচারাধীন রাজনীতিক বন্দীদেরই শুধু প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হতো। দণ্ডিত রাজনীতিক বন্দীদের পাঠিয়ে দেওয়া হতো আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। পাশাপাশি দু’টি সেন্ট্রাল জেল। নজরুল ইসলামকেও বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীরূপে পরিগণিত করে প্রেসিডেন্সী জেল হতে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সে ক’মাস বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে এই জেলেই থাকল। অসহযোগ আন্দোলন থেমে গিয়েছিল। তার ফলে বঙ্গীয় সরকারের নীতিতেও পরিবর্তন ঘটল। সরকার ঠিক করল অল্প সংখ্যক রাজনীতিক কয়েদীকেই শুধু বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে

গণ্য করা হবে। তাঁদের সকলকে রাখা হবে বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে। বাকীরা সাধারণ কয়েদীরূপে গণ্য হবেন। তাঁদের সকলকে হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট জেলে পাঠান হবে। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের সাজাপ্রাপ্ত বিশেষ শ্রেণীর রাজনীতিক কয়েদীদের জানানো হলো না যে তাদের মধ্যে কে কে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী থাকলেন, আর কে কে সাধারণ কয়েদীতে অবনমিত হলেন। সকল বন্দীকেই জানানো হলো যে তাঁরা বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে বদলী হচ্ছেন। তাঁদের পোশাক বদলানো হলো না। বিশেষ শ্রেণীর বন্দীদের তাঁদের জেলের বাইরের পোশাকের মতো পোশাক, অর্থাৎ ধুতি, শাট ইত্যাদি দেওয়া হতো। যে-সকল বন্দীকে সাধারণ বন্দীতে অবনমিত করা হয়েছিল, অবশ্য তাঁদের নৈহাটি ফেটশনে নামিয়ে হুগলী জেলে নিয়ে গিয়ে জাজিয়া ও খাটো কুতী পরিণত দেওয়া হতো। এই ব্যবহার যাঁদের সঙ্গে করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কবি নজরুল ইসলামও ছিল। এই রকম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই নজরুল ও অন্য বন্দীরা দীর্ঘ দিনের অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। এই সময়ে আবদুল হালীমের নামে গোপনে ডাকে দেওয়া নজরুলের একখানা পত্র আসে। পত্র পেয়েই সে হুগলী চলে যায় এবং সব খোঁজখবর নিয়ে আসে। ঘটনাটি খবরের কাগজে ছাপানোর ব্যবস্থাও করা হয়। নজরুলের অনশন ধর্মঘট সম্বন্ধে অনেকেই বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন। আমি সে সম্বন্ধে আর লিখব না।

অনশন ত্যাগ করবার পরে নজরুলকে আবার বিশেষ শ্রেণীর বন্দীতে পরিণত করে বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বঙ্গীয় সরকার কৈফিয়ৎ দিল যে তাদের অনুসন্ধান দেখা গেছে যে নজরুল ইসলামের কোনও সামাজিক মর্যাদা (তার মানে সম্পত্তিগত মর্যাদা) নেই। তবে, তিনি কবি ও গ্রন্থকার হওয়ার কারণে তাঁকে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা দেওয়া হলো।

১৯২৩ সালের জুলাই মাসে আমি আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ১৮১৮

সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে স্টেট প্রিজনার (বিনা বিচারে বন্দী) ছিলাম । একটি ওয়ার্ডে আমায় একা রাখা হয়েছিল । সেই সময়ে একদিন সকাল বেলা আমার চায়ের ট্রে-তে টি-পটের তলায় চাপা দেওয়া নজরুলের নিজের হাতের লেখা একখানা দীর্ঘপত্র পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম । তখন কয়েকদিনের জন্যে অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জীকে বহরমপুর জেল হতে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে আনা হয়েছিল । তিনিই পত্রখানা সঙ্গে এনেছিলেন এবং কোনও কোশলে তা আমার চায়ের ট্রেতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন । পত্রে নজরুল তার নিজের খবর লিখেছিল এবং খবর দিয়েছিল যে সে তার সহবন্দী মাদারীপুরের শ্রীপূর্ণ দাসের অনুরোধে একখানা “চারণ-গীতি” রচনা করছে । শ্রীপূর্ণ দাস নাকি নজরুলকে জানিয়েছিলেন যে তিনি বাইরে গিয়ে চারণ দল গঠন করবেন । এই পুস্তক রচিত হয়েছিল । এর পাণ্ডুলিপি জেলের বাইরেও পাঠিয়েছিল, কিন্তু নজরুল বাইরে এসে তার কোনও সন্ধান পায়নি ! দুর্ভাগ্য যে নজরুলের একটি সৃষ্টি এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেল ।

শ্রীঅমরেশ কাঞ্জিলালের সম্পাদনায় “ধুমকেতু” আবার বের হয়েছিল । কিন্তু বেশীদিন তা টেকেনি ।

প্রমীলা ও নজরুলের বিবাহ

আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময়ে সেই যে নজরুলের পত্র আমি পেয়েছিলাম তার পরে অনেক দিন তার কোনও খবর আমি পাইনি। আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হতে বদলী হয়ে আমি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যাই এবং সেখানে ক'মাস থাকার পরে আবার বদলী হয়ে আসি কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে। আসলে প্রেসিডেন্সী জেলে এসেছিলাম কানপুর যাওয়ার পথে। এখানে মাত্র দশ দিন থাকার পরে আমাকে কানপুরে নিয়ে যাওয়া হয় বিচারার্থীন বন্দীরূপে। এটা ১৯২৪ সালের মার্চ মাসের কথা। কানপুর কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র (খবরের কাগজে বলশেভিক ষড়যন্ত্র শিরোনাম দেওয়া হতো) মোকদ্দমার আসামীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। মোকদ্দমা চলার সময়ে কলকাতা হ'তে আবদুল হালীম আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতো। সে সময়ে তার কাছ থেকে খবর পাই যে নজরুল যথাসময়ে জেল হতে মুক্তি পেয়েছে এবং শ্রীমুক্তা গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলার সঙ্গে শীঘ্রই তার বিয়ে হবে।

১৯২২ সালের শুরুর দিকে (মাস মনে নেই) “মোস্লেম ভারত”-এ ছাপাবার জন্যে কুমিল্লা হ'তে আফজালুল হক সাহেবকে নজরুল একটি গান পাঠায়। গানটি পড়েই আফজল সাহেব বললেন গিরিবালা দেবীর মেয়ের সঙ্গে নজরুলের বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। আমি বললাম, নজরুল লিখেছে গান। এর ভিতর থেকে আপনি আবার বিয়ে খুঁজে বা'র করতে যাচ্ছেন কেন? তা ছাড়া ছলিতো (প্রমীলার ডাক নাম) ছোট মেয়ে। আফজল সাহেব বললেন, আপনার যেমন বুদ্ধি! আমি চুপ করে থাকলাম। নজরুলের গানটি ছিল এই :

“হে মোর রানী ! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে ।
 আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে ।
 আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
 দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
 এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
 এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ॥
 ওগো জীবন-দেবী !
 আমার দেখে কখন তুমি ফেল্লে চোখের জল,
 আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল !
 আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে,
 বিজয়িনী ! নীলাধরীর অঁচল তোমার উড়ে,
 যত তুণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
 আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে ॥

“বিজয়িনী” শিরোনামে এই গানটি নজরুলের “ছায়ানট” নামক কবিতা পুস্তকে স্থান পেয়েছিল। এই পুস্তকটি আবার উৎসর্গ করা হয়েছিল আমার আর কুতুবুদ্দীন আহমদ সাহেবের নামে।

কানপুর জেলে আবদুল হালীমের মুখে নজরুলের বিয়ে হবে খবর পেয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে আফজল সাহেবই ব্যাপারটি ঠিক বুঝেছিলেন। এই সব ব্যাপারে আমার বুদ্ধি বরাবরই কম। যে-ছেলে মেয়েদের ছোট দেখছি তারা যে বড় হয় তা বুঝতেও আমার সময় লাগে। শুনেছি ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে নজরুল আর প্রমীলার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার ৬, হাজী লেনের বাড়ীতে। এই বিয়েতে যঁারা উছোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুলেখিকা মিসেস্ এম রহমান (“মা ও মেয়ে” উপন্যাসের রচয়িত্রী) এবং মঈন উদ্দীন হোসায়ন সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নজরুলের স্ত্রীর প্রকৃত নাম প্রমীলা সেনগুপ্তা ! অনেকের লেখায় আশালতা

সেনগুপ্তা নাম আছে। এই নাম কেন হয়েছিল, কখন হয়েছিল তা আমার জানা নেই। নজরুলদের বিয়ে অনেকের পসন্দ হয়েছিল, আবার অনেকের পসন্দ হয়নি। বিয়ের পরে ব্রাহ্ম সমাজের একটি অংশ যে নজরুলের ওপরে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন ১৯২৬ সালেও তার রেশ চলছিল। (জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে আমি ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম)। এই বিরূপতা থেকেই “শনিবারের চিঠি” ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিল কিনা তার অনুসন্ধান আবশ্যিক। গোটা ব্রাহ্ম সমাজই নজরুলের ওপরে চটেছিলেন এমন কথা বলা যায় না। কারণ, ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের মতো অনেক ব্রাহ্মের সঙ্গে আমি নজরুলের সম্ভাবও লক্ষ করেছি।

মোটের উপরে, কারা-মুক্তির পরে নজরুলের জনপ্রিয়তা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। প্রমীলার সঙ্গে তার বিয়ে তার জনপ্রিয়তার পথে এতটুকুও বাধা সৃষ্টি করেনি। এসময়ে নজরুল সর্বত্র নিমন্ত্রিত ও অভিনন্দিত হচ্ছিল। ভারতের ব্রিটিশ সরকার নজরুলের যে-সব বই বাজয়াফ্ত করেছিল সে-সব বই, বিশেষ করে নিষিদ্ধ হওয়া কবিতার বইগুলি পাওয়ার জন্যে অনেক লোকের একান্ত চেষ্টা লক্ষ করে অবাক হয়ে যেতে হতো। ১৯২৬ সালে আমি নিজের চোখে দেখেছি, বহু লোক আবদুল হালীমের নিকটে আসতেন এবং বলতেন আবদুল হালীম যদি বইগুলি জোগাড় করে দেন তবে তাঁরা বাধিত হবেন। তাঁদের মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সব রকমের লোককে দেখা গেছে। সঙ্গেপানে বড় বড় রাজ-কর্মচারীর ছেলেদেরও আমি নিষিদ্ধ পুস্তকের জন্যে আসতে দেখেছি। বিশ্বাস করতে পারলে হালীম সকলকেই বই জোগাড় করে দিত। কোথায় কোন দফতরির বাড়ীতে এইসব পুস্তকের ছাপান ফর্যাগুলি অল্প অনেক স্তপীকৃত ছাপান ফর্মার সঙ্গে মেশানো ছিল হালীম তা জানত। তার ওপরে পুলিশের কড়া নজর ছিল। অনেক ফন্দি

করে পুলিশের নজর এড়িয়ে তাকে এই কাজ করতে হতো। নজরুলের বন্ধুত্বের খাতিরে বিপদের সকল সম্ভাবনাকে সে অগ্রাহ্য করত। এই প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে নিষিদ্ধ পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা নজরুলের দুঃস্থ পরিবার তখন খুবই উপকৃত হতো। বিপদ উপেক্ষা করে দফতরির সাহায্যও লক্ষণীয়।

বিয়ের পরে নজরুল হুগলীতে বাসা করেছিল। আলমোড়া জেল হতে মুক্তি পাওয়ার পরে কয়েক মাস আমি আলমোড়াতেই থেকে গিয়েছিলাম। সে সময়ে হুগলী হতেই আমি নজরুলের পত্র পেয়েছিলাম। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়ে জানা যায় যে হুগলীতে বাসা পেতে নজরুলকে বেগ পেতে হয়েছিল। মুসলিম নামধারী লোকদের বাসার জন্যে মাঝে মাঝে এই রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। হুগলীতে নজরুলকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল। হয়তো সেখানে তার আরও অনেক অসুবিধা ছিল। ১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে আমি কলিকাতায় ফিরে আসি। সে দিনই কিংবা তার পরের দিন শ্রীহেমস্তুকুমার সরকার নজরুলদের কৃষ্ণনগরে নিয়ে যান। এখানে নজরুলরা সহজেই বাড়ী পেয়ে গিয়েছিল। হেমস্তুকুমার সরকাররা তাঁদের বাসভবনের একটি হিসসা নজরুলকে ভাড়া দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরে সহানুভূতিশীল স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তারও পাওয়া গিয়েছিল যিনি নজরুলের চিকিৎসা করতেন।

ছাত্ররা অসুস্থ নজরুলের বাজার ক'রে দিতেন। এসব ছাত্রের মধ্যে শ্রীগোবিন্দ দত্ত ও শ্রীপ্রমোদ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীসরকারদের বাড়ীটি পুরোনো হওয়ার কারণে কিঞ্চিৎ অস্বাস্থ্যকর ছিল। পরে নজরুল রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার পথে শ্রীমন্টন-দের একটি ভাল বাড়ী পেয়ে সেখানে উঠে গিয়েছিল। এই বাড়ীতে নজরুলের পুত্র বুলবুল (নজরুল তার ভালো নাম রেখেছিল অরিন্দম খালিদ) জন্মেছিল।

সক্রিয় রাজনীতি

নজরুল তার গানে যতই লিখুক,

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে,
বিজয়িনী! নীলাশ্বরীর আঁচল তোমার উড়ে

নজরুলের এই যুগটি তার সক্রিয় রাজনীতিরও যুগ। এই যুগে বাঙলা দেশের সর্বত্র সে ঘুরে বেড়িয়েছে, বক্তৃতা দিয়েছে ও আন্দোলন করেছে। তার আন্দোলন শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকেনি, সে আন্দোলন করেছে কৃষক ও জেলেদের ভিতরেও। এই রকম অনেক সভা-সমিতিতে শ্রীহেমন্তকুমার সরকারও সঙ্গে থাকতেন। এই সময়ে শ্রীসরকার কৃষক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়েছিলেন যার জন্তে কংগ্রেসের ভিতরে তিনি অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়েন। কংগ্রেসের জমিদার নেতারা (শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের নামোল্লেখ করা যায়) রটনা করে দেন যে শ্রীহেমন্তকুমার সরকার পুলিশের লোক। যাক, নজরুল এই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও সভ্য হয়। ১৯২৫ সালের শেষ দিকে কলকাতায় একটি নূতন পার্টি গঠিত হয়। নজরুল ইসলাম, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, কুতুবুদ্দীন আহমদ ও শামসুদ্দীন হোসায়ন এই পার্টি গড়ার কাজে উছোগী হয়েছিলেন। শামসুদ্দীন হোসায়ন আবদুল হালীমের বড় ভাই (দাদা) ছিলেন। তিনি এক সময়ে শাস্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করতেন। ১৯২৬ সালে তিনি মারা গিয়েছেন।

পার্টির নাম প্রথমে ছিল 'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের) অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি (The Labour

Swaraj Party of the Indian National Congress)।
 কংগ্রেস হতে আলাদা হয়ে গিয়ে নূতন রাজনীতিক পার্টি গড়ে তুলতে
 শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের বোধহয় বাধছিল। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী
 মাসে কৃষ্ণনগরে এই পার্টির একটি সম্মেলন হয়। ডক্টর নরেশচন্দ্র
 সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তও
 এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েই
 তিন বছর পরে নজরুলের সঙ্গে আমার আবার দেখা হলো। সে
 “শ্রমিকের গান” শীর্ষক গানটি রচনা করে সম্মেলনে গেয়েছিল। গানটি
 তখন “লাঙল”-এ ছাপা হয়েছিল। পরে তা তার “সবহার” নামক
 কবিতা পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

পুরো “শ্রমিকের গান” অনেক বড়। আমি তার কিছু অংশ
 এখানে তুলে দিচ্ছি :—

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী-দল !
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
 পায়ের সুখে ভাঙব চল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
 পাহাড় ট'লে তুষার গ'লে
 মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে।

মোরা সিন্ধু মখে এনে সুধা
 পাইনা ক্ষুধায় বিন্দুজল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি
 কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
 হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলি রে!

আজ মানব কুলের কালি মেখে
 আমরা কালো কুলির দল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

*

*

*

*

নজরুল কয়লা খনি অঞ্চলের লোক। সে যখন মজুরদের কথা লিখতে গেছে তখন তার চোখে যে খনি মজুররা ভেসে উঠেছে তা লক্ষণীয়।

কৃষ্ণনগর সম্মেলনেই লেবর স্বরাজ পার্টির নাম পরিবর্তিত হয়ে “বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল” হয়। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত তা আর থাকে না।

১৯২৫ সালের শেষ ভাগে “লেবর স্বরাজ পার্টি” গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই “লাঙল” নাম দিয়ে তার সাপ্তাহিক কাগজ বা’র করা হয়। এই কাগজের মলাটের ওপরে লেখা থাকত—প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। সম্পাদক রূপে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছাপা হতো। তিনি নজরুলের পন্টনের বন্ধু ছিলেন, দরাজ গলায় তার গান গেয়ে বেড়াতেন। বাঙালী পন্টন উঠে যাওয়ার পরে ইফ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে তাঁর চাকুরি হয়েছিল। পরে তাঁর সেই চাকুরি চলে যায়। মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় “লাঙল”-এর সম্পাদনা অবশ্য করতেন না। তিনি তাঁর নাম ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন, মোকদ্দমা হলে জেল খাটতেও রাজি ছিলেন। কিছুকাল হ’তে তিনি গেরুয়া কাপড় পড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। অনেককাল পরে পরে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়।

১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে “লাঙল”-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বহু উপ-শিরোনামে বিভক্ত নজরুলের বিখ্যাত “সাম্যবাদী” শীর্ষক কবিতা এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এই কবিতার “নারী” উপ-শিরোনামে নজরুল বলেছে :

“সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই !
বিশেষ যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অধেক তার করিয়াছে নারী, অধেক তার নর ।

* * * *

পুরুষ হৃদয়হীন

মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ ।
ধরায় যাঁদের যশ ধরে না'ক অমর মহামানব
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়েছে বিলাসী পিতা ।
লব কুশে বনে ত্যাজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা ।

* * * *

সে যুগ হয়েছে বাসি,

যে যুগে প্রবল পুরুষে করিল নারীরে অবলা দাসী ।
বেদনার যুগ, মানুষ্যের যুগ, সাম্যের যুগ আজি
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি ।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে ।
যুগের ধর্ম এই—

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই !

শোনো মর্ত্যের জীব !

অন্তরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব !

*

*

*

*

“কুলি-মজুর” শিরোনামে নজরুল লিখেছেন :—

আসিতেছে শুভ দিন,

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ !
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,

পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
 তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
 তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
 তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান
 তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !
 তুমি শুয়ে রবে তেতালার 'পরে আমরা রহিব নীচে,
 অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে !
 সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা-রসে,
 এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে !
 ('লাঙল' হতে উদ্ধৃত)

“সাম্যবাদী” নাম হলেও কবিতাটি ছন্দোবদ্ধ মার্ক্সবাদ নয়।
 মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ব্যবহার, নারীর সঙ্গে পুরুষের দুর্ব্যবহার,
 কবির অনুভূতিকে যে পীড়া দিয়েছে তা এই বিরাট কবিতার সর্বত্র ফুটে
 উঠেছে। কবিতাটিতে এমন সব ছত্র আছে যে-সব সাহিত্যের সম্পদ
 হয়ে থাকবে। তবে, ‘সাম্যবাদী’ একেবারে মার্ক্সবাদ পরিশূণ্যও নয়।
 সমাজে যে শ্রেণী-সংগ্রাম আছে তা এই কবিতায় ধরা পড়েছে এবং শ্রেণী-
 সংগ্রামের পরিণতি যে মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে ক্ষমতা অধিকার—“এই
 ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে”—তাও স্বীকৃত হয়েছে এই
 কবিতায়।

১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ‘লাঙল’ এর দ্বিতীয় সংখ্যা
 প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ছাপা হয়েছিল নজরুলের ‘কৃষকের গান’।
 “কৃষকের গান” হ’তে কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি :—

	ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কসে লাঙল।
আমরা	মরতে আছি—ভাল ক’রেই মরব এবার চল ॥
যোদের	উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
	ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই	লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষী মায়েষ কেশ
আজ	মা’র কাঁদনে লোনা হ’ল সাত সাগরের জল ॥

*

*

*

*

আজ চার্দিক হ'তে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জেঁকের মতন শুষছে রক্ত কাড়ছে থালার ভাত
মোর বৃকের কাছে মরছে থোকা, নাইক' আমার হাত ।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল ॥

*

*

*

*

আজ জাগরে কুষণ, সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয় ।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যু রাজার হয়কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার সময়ে আমি কলকাতায় উপস্থিত ছিলাম না। আমার ফিরে আসার পরে ১৯২৬ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে বা'র হয় 'লাঙল' এর তৃতীয় সংখ্যা। এই সংখ্যাতেই প্রথম ছাপা হয়েছিল বহু কণ্ঠে আবৃত্ত নজরুলের 'সব্যসাচী' শীর্ষক কবিতা। এই কবিতার শেষ শ্লোকটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

“মশা মেরে' ঐ গরজে কামান—‘বিপ্লব মারিয়াছি’!
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাঁও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি।”

(‘লাঙল’ হ'তে উদ্ধৃত)

‘লাঙল’ কিছু কাল চলার পরে তার নাম পরিবর্তন করে “গণদ্বানী” করা হয়। কিছুদিন পরে মনিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর নাম ব্যবহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁর জায়গায় শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাসের নামে

আদালত হতে ডিক্লারেশন নেওয়া হয় এবং 'লাঙল' এর সম্পাদক হিসাবে তাঁরই নাম ছাপা হতে থাকে। তিনি বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সভ্য ছিলেন। ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডে, আমাদের সঙ্গেই তিনি থাকতেন। ১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে 'গণবাণী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। 'লাঙল' নাম হ'তে অনেকে মনে করতেন যে তা কেবল কৃষকদের মুখপত্র। লোকে কাগজখানাকে শ্রমজীবী জনগণের মুখপত্র হিসাবে নিবেন এই আশায় আমরা 'লাঙল' এর নাম "গণবাণী"তে পরিবর্তন করি।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা

১৯২৬ সালে কলকাতার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আমাদের কাজের প্রবল বিঘ্ন ঘটায়। বারে বারে তিন বার এই দাঙ্গা হয়। কলকাতার তো বটেই, সমস্ত বাংলা দেশের আব-হাওয়াও এই দাঙ্গা বিষিয়ে তুলেছিল। আমাদের মনে হতো কৃষক ও শ্রমিক দলের আমরা ক'টি-হিন্দু-মুসলিম নামধারী ছাড়া কলকাতার অন্য সব লোকই অতি হিন্দু কিংবা অতি মুসলিম হয়ে পড়েছে। হিন্দু-মুসলিম সংবাদ পত্রগুলি রাত-দিন সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছিল। আমরা আমাদের কাগজের মারফতে এবং বাঙলা, উর্দু ও ইংরাজীতে ইশ্‌তিহার বিতরণ ক'রে দাঙ্গার বিরুদ্ধে যুঝছিলাম। কিন্তু দাঙ্গার কারণে “লাঙল” এর প্রচার খুবই কমে গেল, আর সাম্প্রদায়িক কাগজগুলির প্রচার অতি মাত্রায় বেড়ে গেল। দাঙ্গা নজরুল ইসলামকেও অত্যন্ত বিচলিত ক'রে তুলেছিল। তার এই সময়কার প্রবন্ধ ও কবিতা পড়লে তা বোঝা যায়। কবিতাগুলি তো পরে কোনো না কোনো পুস্তকে স্থান পেয়েছে, কিন্তু গद्य প্রবন্ধগুলি সংবাদ পত্র ছাড়া কোনও পুস্তকে সঙ্কলিত হয়নি।

কংগ্রেসের অধিনায়কত্বে বছর বছর বাঙলা দেশে একটি রাজনীতিক সম্মেলন হতো। তাকে বলা হতো বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক আব-হাওয়ার মধ্যে ১৯২৬ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন কৃষ্ণনগরে হয়েছিল। এই সম্মেলনেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাঙ্ককে নাকচ ক'রে দেওয়া হয়। এই নাকচ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল “কংগ্রেস কর্মী-সঙ্ঘ”। এটা মন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার

আব-হাওয়ায় মর্মান্বিত নজরুল সম্মেলনের জন্য যে-উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করেছিল তা আমাদের সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

“দুর্গম গিরি, কান্তার মরু ছন্তর পারাবার
লজ্জিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার”

এই কোরাসের সহিত নজরুল যে-গানটি লিখেছে তা অনেকে পুস্তকে পড়েছেন, অনেকে অণুদের গাইতে শুনেছেন, আবার অনেকে নিজেরাও গেয়েছেন। এমন জোরালো দরদভরা ভাষা, এমন উদাত্ত আবেদন খুব কম লেখাতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের লজ্জার বিষয় বলতে হবে—সম্মেলনের মধ্যে দাঁড়িয়ে নজরুল যখন অণুদের সঙ্গে কোরাসে এই গান গাইছিল তখনই সম্মেলনে বিতরিত হচ্ছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষে পরিপূর্ণ এক ইশ্‌তিহার।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী তাঁর “সঙ্গীতে কাজী নজরুল ইসলাম” প্রবন্ধে লিখেছেন যে ‘সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারা উপরুদ্ধ হয়ে’ নজরুল ‘দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, ছন্তর পারাবার’ রচনা করেছিল। এটা ঠিক কথা নয়। বাঙলার প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন এপ্রিল মাসে হতো। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র বসু বর্মার জেলে রাজবন্দী ছিলেন। তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন তার অনেক কাল পরে। অবশ্য, গানটি সম্বন্ধে শ্রীচৌধুরী বলেছেন, ‘গানের সত্যিই তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। এটি বাংলা দেশের একটি অভ্যুৎকৃষ্ট কোরাস সঙ্গীত।’

১৯২৬ সালে ব্রিটেনে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল। এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ করেও নজরুল একটি কবিতা রচনা করেছিল। কবিতাটি ‘যা শত্রু পরে পরে’ শিরোনামে প্রথমে বর্ধমানের ‘শক্তি’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল (আশ্বিন ১৩৩৩), তার পরে তা উদ্ধৃত হয়েছিল ‘গণবাণী’তে (১২ই অক্টোবর, ১৯২৬, মৃত্যাবিক ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩৩)। নজরুলের ‘কগি-মনসা’ নামক কবিতা পুস্তকে এই কবিতাটি স্থান পেয়েছে।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হ'তে নজরুল এই কবিতাটি লিখেছেন। এতেও
সে বাঙলার হিন্দু-মুসলিম কলহের কথা ভুলতে পারেনি। সে
লিখেছেন :—

“ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলমিন !
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন !
ধর্ম কলহ রাখ ছুদিন !

নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডুষ ফের করিবা কাঁচিয়া
আসিবে না ফিরে এই সুদিন !
বদনা গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি,
কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পক্ষ লীন !”

এই সময়ে নজরুল তার “হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ” শীর্ষক কবিতাও
লেখেন। কবিতাটির প্রথম শ্লোক হচ্ছে :

“মাঠে ! মাঠে ! এতদিনে বুঝি ভারতে জাগিল প্রাণ।
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি ব্যথা-জাগ্রত,
খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি, অজুন ছোঁড়ে বাণ !
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান”

১৯২৬ সালের ২৬ শে আগস্ট (৯ই ভাদ্র, ১৩৩৩) তারিখের
‘গণবাণী’তে নজরুলের ‘মন্দির ও মসজিদ’ শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল
এই প্রবন্ধটি তার কোনও পুস্তকে স্থান পায় নি। প্রবন্ধটি শুরু হয়েছিল
এই ভাবে; “মারো শালা যবনদের।” ‘মারো শালা কাফেরদের।’
আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি
তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর

“প্রেষ্টিজ” রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া টীংকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহার। আল্লা মিঞা বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আতর্নাদ করিতেছে—বাবা গো মা গো!” মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!”

নজরুলের “পথের দিশা” শীর্ষক কবিতাও ১৯২৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে লক্ষ্য করে লেখা। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় “অগ্রদূত” নাম দিয়ে এই সময়ে একখানা কাগজ বাঁর করেছিল। শচীনন্দনের অনুরোধে “অগ্রদূত”—এর জগ্গে “পথের দিশা” লেখা হয়েছিল। কবিতাটি শুরু হয়েছিল এই ভাবে :

“চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েসির আখুড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে ?
পারবি যেতে ভেদ ক’রে এই বক্র পথের চক্রবাহ ?
উঠবি কি তুই পাষণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন্ অভিযান করবি, গুনি ?

১৯২৬ সালের দাঙ্গা সম্বন্ধে নজরুল আরও প্রবন্ধ লিখেছিল। হাতের কাছে পত্রিকা নেই বলে সে-সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারলাম না।

নজরুলের গান

গোড়াতেই ব'লে রাখছি যে গানের আমি কিছুই বুঝি না, তবে অণু অনেকের মতো গান শুনতে আমারও ভাল লাগে। ১৯২০ সালে নজরুল আর আমি যখন ৮-এ, টার্নার স্ট্রীটের (এখন নওয়াব আবদুর রহমান স্ট্রীট) বাড়িতে থাকতাম তখন শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তার নিকট হ'তে নজরুল একখানা পত্র পায়। তিনি একজন ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। বাঙলা দেশের বহু মাসিক পত্রে তাঁর তৈয়ার করা গানের স্বরলিপি ছাপা হতো। ইতোমধ্যে তিনি নজরুলেরও দু'একটি ছোট কবিতায় সুর সংযোজন করেছিলেন। গানের কায়দা-কানুনের বন্ধনের ভিতরে গান রচনা করার জন্মে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা সেই চিঠিতে নজরুলকে অনুরোধ করেছিলেন। অর্থাৎ গানের নাকি আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটি ভাগে বিভক্ত হওয়া দরকার। এই ভাবে বিভক্ত গানই সেনগুপ্তা মহাশয়া নজরুলকে লিখতে বলে-ছিলেন। আমি লক্ষ করেছি তখন থেকে নজরুল তার বেশীর ভাগ গান এই কায়দা মেনে লিখত।

নজরুল আসলে শুরু হ'তেই সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল। আমার মতো তার অরসিক বন্ধুরা তা বুঝতে পারত না। আমরা না বুঝে তাকে অনেক সময়ে আঘাত দিতাম। আমার মনে আছে, একদিন শ্রীভূপতি মজুমদার বলেছিলেন—“নজরুল, কী ভুমি এত ভাল গান গাও যে গান পেলেই মেতে ওঠ।” সেদিন নজরুল খুব আহত হয়েছিল। সে বলেছিল, “ভূপতি-দা আমার কবিতার যত খুশী সমালোচনা করুন, কিন্তু আমার গানের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।”

পরে বুঝেছিলাম নিজের ওপরে তার অনেক প্রত্যয় ছিল ব'লেই সে শ্রীমজুমদারকে ওই রকম বলতে পেরেছিল।

নজরুল ছোট বড় কবিতা লিখেই চলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে গানও রচনা করত। তার গানের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। বাঙলায় সে যখন গজল গানের প্রচলন করল তখন দেশ সত্যি চমকে গেল। গজলগুলি নজরুলের অপূর্ব সৃষ্টি। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে তার গানগুলি দেশে জনপ্রিয় হচ্ছিল। শ্রীদিলীপকুমার রায় ও অন্যান্য নজরুলের গজল গানগুলিকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করেছিলেন। বাঙলা রঙ্গমঞ্চে যে গানের ধারা বদলে গেল তাতেও শুনেছি নজরুলের অবদান আছে। আমার বিচার দৌড় কিন্তু খবরের কাগজের প্রবন্ধ পর্যন্ত। এ সম্বন্ধে আমার আর কিছু জানা নাই।

গানের জগতে নজরুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়ছিল বটে, কিন্তু সে রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে যোগ দিত ব'লে এবং তার পেছনে পেছনে পুলিশের চরেরা-যুরে বেড়াত ব'লে গ্রামোফোন কোম্পানী নজরুলকে এড়িয়ে চলত। তার গান রেকর্ডে উঠত না। শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের দু'টি কবিতার অংশ বিশেষে সুর দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গেয়েছিলেন। তবে তিনি রচয়িতার নাম গোপন রেখেছিলেন। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত গানের রাজ্যে নজরুল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই বছরই দেশের নানান জায়গা হতে গ্রামোফোন কোম্পানীর নামে চিঠি আসতে থাকে যে নজরুল ইসলামের গান কেন রেকর্ডে উঠছে না। তখন গ্রামোফোন কোম্পানী একথাও জানতে পারে যে শ্রীহরেন্দ্র ঘোষের গাওয়া গান দু'টি নজরুল ইসলামের রচনা। এই রেকর্ড দু'খানা ভালো বিক্রয় হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানীর তখন চোখ খুলে গেল। তখন তাদের সামনে বড় হয়ে দেখা দিল ব্যবসায়। তাঁরা নজরুলের বাসা খুঁজে বা'র ক'রে শ্রীহরেন্দ্র ঘোষের গাওয়া গান দু'টির রয়ালটি বাবতে কয়েক শ' টাকা নজরুলের নিকটে পাঠিয়ে

দিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গান দেওয়ার জন্যেও তাঁরা নজরুলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। এই হল গ্রামোফোন কোম্পানীর সহিত নজরুলের সংস্রবের সূত্রপাত। ১৯২৯ সালের শুরুর কথা।

এই সময়ে নজরুলরা কলকাতায় চলে এসেছিল। কলকাতায় তাকে বারে বারে আসতেই হতো। তার কৃষ্ণনগরে থাকার তেমন কোনও দরকারও ছিল না। কলকাতার ৮১, পান বাগান লেনে (ইটালী এলাকায়) তারা বাসা পেয়ে গেল। এই বাড়ীর নীচের দু'খানা ঘরে শ্রীশান্তিপদ সিংহরা থাকত। শান্তিপদ সিংহের কথা আমি আগে বলেছি। আর, তার দোতালার দু'খানা ঘরে নজরুলরা থাকত। অবশ্য, কৃষ্ণনগর হ'তে সোজামুজি তারা পান বাগানের বাড়ীতে এসে ওঠেনি। তার আগে আরও দু'এক জায়গায় তারা অস্থায়ীভাবে ছিল। পান বাগানের বাসাটি তারা শান্তির কল্যাণে পেয়েছিল। মোটামুটি ভালো বাসাই ছিল। পান বাগানের বাসাতেই আমি প্রথম ওস্তাদ জমীর উদ্দীন খানকে যাতায়াত করতে দেখি। তাঁর নিকটে নজরুল তার ওস্তাদী গানের বিছাটা ঝালিয়ে নিয়েছিল। ১৩৩৯ সালের ১লা আশ্বিন “বন-গীতি” নামক গানের পুস্তকটি তাঁকে উৎসর্গ করতে গিয়ে নজরুল লিখেছে :

“ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলা-বিদ

আমার গানের ওস্তাদ

জমীর উদ্দীন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে”

যে কবিতায় বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে তার শেষ দুটি ছত্র এই :

“সুর শা’ জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুলী তুমি,

মোর “বনগীতি” নজরানা দিয়া দস্ত চুমি।”

‘দস্ত’ পারসী শব্দ—মানে হাত। “মোবারক” আরবী ভাষার শব্দ। তার মানে শুভ।

ওস্তাদ জমীর উদ্দীন খান গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের ওস্তাদ (ট্রেনার) ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে নজরুল এই পদে নিযুক্ত হয়েছিল।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী তাঁর “সঙ্গীতে কাজী নজরুল ইসলাম” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ—

“কাজী নজরুল ইসলাম সবশুদ্ধ অনুমানিক তিন হাজার গান রচনা করেছেন। পৃথিবীর সঙ্গীত রচনার ইতিহাসে এইটেই বোধ হয় সর্বোচ্চ রেকর্ড। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা আনুমানিক আড়াই হাজার।” তাঁর মতে “এত বিচিত্র ঢঙের গান বাংলা দেশের অণু কোন সুরকার আজ পর্য্যন্ত রচনা করেন নি।” অণু অনেক পুস্তকের সঙ্গে নজরুল ইসলামের গান ও স্বরলিপির পুস্তকগুলিও সূদখোর মহাজনের নিকটে বাঁধা পড়েছিল। মহাজন সম্ভবত সূদ সমেত তাঁর টাকা তুলে নিয়েছেন, কিন্তু বইগুলি আর ছাপা হচ্ছে না। তার ফলে গানগুলি লোকের স্মৃতি হ’তে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে কুষ্টিয়ায় একটি কৃষক সম্মেলনে রাজনীতিক ক্ষেত্রে নজরুলের সঙ্গে আমার শেষ মিলন ঘটেছিল। শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের নিমন্ত্রণে আবদুল হালীম, নজরুল ইসলাম ও আমি এই সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। কুষ্টিয়া থেকে ফিরে কলকাতায় বেশীদিন টিকতে পারিনি। ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখের ভোর বেলা আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমায় গিরেফতার ক’রে বর্তমান উত্তর প্রদেশের (তখনকার সংযুক্ত প্রদেশের) মীরাটে পাঠানো হয়। সেখানে আমাদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা ১৯২৯-১৯৩৩ চলে। বিচারাধীন বন্দী, দণ্ডিত বন্দী ও বিনা বিচারের বন্দীর স্তর ভেদ ক’রে আমি কলকাতায় ফিরেছিলাম ১৯৩৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। যে-কর্মক্ষেত্র ছেড়ে আমায় জেলে যেতে হয়েছিল সেই কর্মক্ষেত্রেই তারপরে আমি

আবার যোগদান করি। গণ-সংগঠনের কাজ এবং বে-আইনী ঘোষিত
 আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির কাজ আমায় করতে হতো। এই ভাবে
 সাড়ে তিন বছরের কিছু বেশী সময় কেটেছিল। নজরুল ইসলাম
 তখন আর সক্রিয় রাজনীতিতে ছিল না। সে ছিল তার গানের সমুদ্রে
 প্রায় নিমজ্জমান। তার সঙ্গে আমার কম দেখা-সাক্ষাৎ হতো।
 তার স্ত্রী ও শাপুড়ীকে দেখার জন্য আমি মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী
 যেতাম। কোনো দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হতো, আবার কোনো
 দিন দেখা হতোও না। এই সময়ে নজরুলদের ওপর দিয়ে একটা ঝড়ও
 বয়ে যায়। প্রমীলা কঠোর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই
 রোগে সে চিরদিনের জন্য তার উত্থান-শক্তি হারিয়েছে। ১৯৪০
 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা ও আশে-পাশের মজুর এলাকা হ'তে
 গবর্ণমেন্ট অন্য অনেকের সঙ্গে আমাকেও বহিষ্কার করে দেয়। এর
 পরে আমি কলকাতায় ফিরেছিলাম, কিন্তু গা-ঢাকা দিয়ে। ১৯৪২
 সালের শেষ ভাগে বা'র হয়ে এলাম বটে, কিন্তু নজরুল ইসলামকে
 আর স্মৃশ পেলাম না। সে মস্তিস্কের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে
 পড়েছিল। কিন্তু তখনও সে কথা বলতে পারত এবং আমাদের
 চিনতেও পারত। তার পরে সে ক্রমে ক্রমে কথা বলার শক্তি ও
 স্মৃশ দু-ই হারিয়ে ফেলে।

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা

আমি এখন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা এখানে বলব। হয় তো এই ঘটনাগুলির ভিতর হতেও নজরুল ইসলামের চরিত্রকাররা কিছু কিছু মাল-মসলা পেয়ে যেতে পারেন।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মাথরুন হাইস্কুলে (বর্ধমান জিলায় অবস্থিত) নজরুল ইসলাম কিছুদিন পড়েছিল। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। তিনি যে এক সময়ে নজরুলের শিক্ষক ছিলেন তার জন্তে নজরুল আমাদের নিকট গর্ব প্রকাশ করত। শিক্ষকও ছাত্রের কবি খ্যাতিতে মনে মনে গর্ব বোধ করতেন। আমাদের সামনে এটা বোঝার সুযোগ একদিন উপস্থিত হয়েছিল।

আমরা ক'জন এক দুপুর বেলা ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীতে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে বসেছিলাম। নজরুল ইসলামও সেখানে হাজির ছিল। এমন সময়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এসে খবর দিল যে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। খবর পেয়েই নজরুল খালি পায়ে নীচে ছুটল। জুতোতে পা গলাবার বিলম্ব কি সওয়া যায়? সে কি করে দেখবার জন্তে আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে নীচে ছুটলাম। নীচে এসে দেখলাম কবি কুমুদরঞ্জন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে এসেই নজরুল তাঁর পায়ের ধুলো নিল। তাঁকে সসম্মানে দোতালায় নিয়ে যাওয়া হলো। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে তিনি ওপরে যাননি তার কারণ, তাঁর মন দ্বিধাজড়িত

ছিল। নজরুল তাঁকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কত দীর্ঘ বছর পরে ছাত্র-শিক্ষকের সাক্ষাৎ হলো। শুধু ছাত্র-শিক্ষকের সাক্ষাৎ বললে ভুল হবে, কবির সঙ্গে কবির মিলনও হলো। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই কবিতার আবৃত্তি শুরু করলেন না দেখে আমরা অ-কবির স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, ভাবলাম মাঝে মাঝে ছ' এক কথা বলার সুযোগ আমাদেরও ঘটবে। কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে নজরুলের নানান রকমের কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় নজরুল বলে ফেললো, “সার, আমিও আপনার মতো পাগল।” তখনই আমার মনের ভিতরটা কি রকম করে উঠল, ভাবলাম খেপাটা আবার একি ব'লে বসল। কিন্তু কবি কুমুদরঞ্জনের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম তাঁর চোখ-মুখ হতে নজরুলের প্রতি স্নেহ বারে পড়ছে।

নজরুলের পার্সী শিক্ষক

কেউ কেউ লিখেছেন ৪৯ নম্বর বাঙালী পণ্টনের পঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের নিকটে নজরুল পার্সী ভাষা শিখেছিল। নজরুল কবি হাফিজের চতুঃপদী কবিতার (রুবাইয়াতের) বঙ্গানুবাদ করেছে। তার ভূমিকায় সেও এই পঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের নিকটে পার্সী কাব্য পাঠ করার কথা লিখেছে। কিন্তু আমার মনে হয় বাল্যকালে নজরুল তার গ্রামের কোনও মক্‌তবে কিংবা কোনও ব্যক্তির নিকটে কিছু পার্সী নিশ্চয় শিখেছিল। তা না হলে তার বাল্যকালের লেখা পার্সী শব্দবহুল যে-সব কবিতার অংশ অনেকে ছেপেছেন সে-সব কবিতা নজরুল কখনও রচনা করতে পারত না। তা ছাড়াও, নজরুলের পার্সীর আর একজন শিক্ষক ছিলেন। আমরা যদি নজরুলের পার্সী শিক্ষকের কথা বলি তবে এই শিক্ষকের কথাও আমাদের বলতে হবে।

হাফিজ নুরুল্লাহ কলকাতার খিদিরপুরের বাশিন্দা ছিলেন। তাঁর বাবা মুন্সী শাহ্ আমান আলী ছিলেন একজন সাধু লোক। তাঁর নামেই ইক্‌বালপুরে শাহ্ আমান লেন হয়েছে। হাফিজ নুরুল্লাহর কুরআন কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কলকাতা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ ছিলেন। কবিত্বময় উর্দু গদ্য তিনি লিখতেন। এক কথায় সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন হাফিজ নুরুল্লাহ। ১৯১৫ সালে তিনি রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পার্সী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে যান। নজরুল তখন অষ্টম শ্রেণীতে (Class VIII-এ) পড়তেন। মনে হয় দীর্ঘকাল শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে কোনও পার্সী শিক্ষক ছিলেন না, কিংবা থাকলেও নজরুল ইসলাম তাঁকে

গণ্য করত না। হাফিজ নুরুন্নবী স্কুলে যোগ দিয়ে দেখলেন নজরুল দ্বিতীয় ভাষা সংস্কৃত নিয়েছে। নজরুল তখনও কিছু না কিছু লিখত। নুরুন্নবী সাহেব বুঝলেন যে তার ভিতরে সাহিত্যিক শক্তি আছে। তিনি নিজেও সাহিত্যিক রুচির লোক। কাজেই, নজরুল তাঁর ছাত্র না হলে কি চলে? তিনি সংস্কৃত ছাড়িয়ে নজরুলকে দ্বিতীয় ভাষা পার্সী নেওয়ালেন। নজরুল তাঁর ছাত্র হলো। নজরুলের পার্সী ভাষার বনিয়াদ তাঁরই হাতে গড়া। তিনি যদি এই বনিয়াদ না গড়ে দিতেন তবে ভবিষ্যতে পঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের নিকটে নজরুল হাফিজের কাব্য পাঠ করতে পারত না।

পন্টন হতে কলকাতায় ফিরে আসার পরে একদিন নজরুল আমায় বলল যে সে খিদিরপুরে তার শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চায়। আমি বললাম, “তিনি তো আমার বন্ধু। খিদিরপুর জুনিয়র মাদ্রাসায় তাঁর সঙ্গে আমি শিক্ষকতা করেছি।” অদ্ভুত যোগাযোগ! আমরা দু’জনেই এক সঙ্গে হাফিজ নুরুন্নবীর বাড়ী গেলাম। তিনি খুবই খুশী হলেন। শিয়ারশোল স্কুলের চাকরি তখন তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমায় শোনালেন কি রকম জবরদস্তী করে তিনি নজরুলকে পার্সী পড়তে বাধ্য করেছিলেন। তাকে তিনি ছড়ি হাতে নিয়ে তাড়া করতেন, সে দেয়ালে চড়ে যেতো, ইত্যাদি কত কথা। তার পরেও নজরুল আর আমি অনেক দিন এক সঙ্গে নুরুন্নবী সাহেবের বাড়ী গিয়েছি। পরে তিনি মুসলিম ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার হয়েছিলেন। তাতে আমাদের যাওয়া-আসায় বাধত না। কিন্তু তিনি যখন ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট হ’তে ‘খান সাহেব’ উপাধি পেলেন তখন আমরা তাঁর বাড়ীতে যাওয়া আসা ছেড়ে দিলাম। হাফিজ নুরুন্নবী আজ বেঁচে নেই। তবে, তিনিই যে নজরুলের পার্সী শিক্ষার ভিত্তি গেঁথে দিয়েছিলেন একথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

সওগাত

“সওগাত” অনেক দিনের পুরানো বাঙলা মাসিক পত্র। নাসিরুদ্দীন সাহেব ছিলেন তার সম্পাদক। দেশ ভাগ হওয়ার পরে নাসিরুদ্দীন সাহেব তাঁর কাগজ পাকিস্তানে নিয়ে গেছেন। সম্ভবত ঢাকা হতে এখনও তা প্রকাশিত হয়। নজরুল যখন পন্টনে ছিল তখনও তার লেখা ‘সওগাতে’ ছাপা হতো। পন্টন হ’তে ফেরার পরেও সে বরাবর ‘সওগাতে’ লেখা ছেপেছে। এক সময়ে এমনও কথাবার্তা চলেছিল যে নজরুলের সব লেখা প্রথমে ‘সওগাতে’ ছাপা হবে। তার জন্মে ‘সওগাত’ হতে তাকে একটা মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয়নি। নজরুলরা যখন কৃষ্ণনগর হ’তে কলকাতায় ফিরে আসে তখন তারা কয়েক দিন ১১, ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীটে (এখন রফী আহমদ কিদ্‌ওয়াই ষ্ট্রীট) ‘সওগাত’ অফিসের নীচের ঘরে ছিল। এখানে হ’তেই তারা পান-বাগান লেনের বাসায় উঠে যায়।



৩/৪-সি, তালতলা লেন, কলিকাতা। ১৯২১ সালে কাজী নজরুল ইসলাম এই বাড়ীতে থাকতেন। এই বাড়ীর নীচের তলার একখানা ঘরে (ডানদিকে লেটার বক্স খুলানো বন্ধ দুয়ার দেখা যাচ্ছে) তিনি তাঁর বিখ্যাত “বিদ্রোহী” কবিতা রচনা করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গ’ড়ে তোলার বাঙলা দেশের প্রথম পরিকল্পনাও এই বাড়ীতেই হয়েছিল। কোনও ব্যবসায়ী বাড়ীটি এখন গুদাম হিসাবে ব্যবহার করছেন।



৮-এ টার্নার স্ট্রিট (বর্তমান নাম নওয়াব আবদুর রহমান স্ট্রিট), কলিকাতা। ১৯২০ সালে
 দৈনিক “নবযুগ” সম্পাদনার সময়ে অঙ্ককার কাণা গলির ভিতরে এই ছোট্ট বাড়ীটিতে
 কাজী নজরুল ইসলাম থাকতেন। তাঁর প্রথম যুগের বহু বিখ্যাত কবিতা এই বাড়ীতে
 রচিত হয়েছিল।

নওরোজ

‘নওরোজ’ নামক একখানা বাঙলা মাসিকপত্রও ১৯২৬-২৭ সালে বা’র হয়েছিল। তার আফিস ছিল মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে (এখন নাম কেশব সেন ষ্ট্রীট)। এই কাগজের পেছনে একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। কিন্তু সেই ইতিহাস এখানে বলার কোনও প্রয়োজন নেই। এই কাগজ বা’র করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বে-নজীর আহমদ। এখন তিনি পাকিস্তানে থাকেন। কাগজখানা প্রকাশিত হওয়ার আগেই উদ্যোক্তারা নজরুল ইসলামের সঙ্গে একটি বুঝা-পড়া করে নিলেন যে নজরুলের সব লেখাই প্রথমে ‘নওরোজ’ কাগজে ছাপা হবে। তার জগ্গে উদ্যোক্তারা তাকে মাসে মাসে টাকা দেবেন। যতটা মনে পড়ে মাসিক এক শ’ কিংবা এক শ’ পঁচিশ টাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও “নওরোজ”-এ কাজ করতে এসেছিল। আফজালুল হক সাহেবও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্যোক্তারা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ায় ‘নওরোজ’ বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীসজনীকান্ত দাসের সঙ্গে বক্তৃতা

প্রথম সাক্ষাৎ

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কিংবা মার্চ মাসের শুরুর দিকে একদিন নজরুল আমায় বলল যে সে একদিন যখন ট্রামে যাচ্ছিল তখন তার পাশের আসনটি খালি ছিল। সেই আসনে এক জন ভদ্রলোক এসে বসলেন এবং নজরুলকে বললেন, “আমি আপনার একজন ভক্ত।” নজরুল তার নাম জানতে চাইলে তিনি জানানলেন যে তাঁর নাম শ্রীসজনীকান্ত দাস। নজরুলের চেহেরার তখন কি অবস্থা হয়েছিল সে কথা সে আমায় বলেনি। আমি কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমি নজরুলকে বললাম, “তোমার মতো লোক আমি দুনিয়ায় আর একজন দেখিনি। “শনিবারের চিঠি” কত দীর্ঘ কাল তোমার অপ-সমালোচনা করেছে, তোমার বন্ধু হওয়ার কারণে আমাদের গায়েও তার হল বিঁধেছে, আর তুমি কিনা তার সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাসকে নিকট থেকে না হো’ক, দূর থেকেও কোনো দিন চিনলে না! আমারই তো কত দিন তাঁকে দেখার ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু কোন সাহিত্য মজলিসে তো যাই না, কি ক’রে আর দেখব?” এর পরে কয়েক বছর আমি কলকাতা হ’তে অনুপস্থিত ছিলাম। “শনিবারের চিঠি” পড়ার সুযোগ আমার হ’তো না। জানি না, নজরুলের সমালোচনা তা থেকে বন্ধ হয়েছিল কিনা। তবে তার পরে নজরুলের সঙ্গে শ্রীসজনীকান্ত দাসের মাথামাথি খুব বেড়েছিল। শ্রীসজনীকান্ত দাস নিজেই ১৯৪৩ সালে এক দিন আমায় এই কথা বলেছিলেন।

“শনিবারের চিঠি”র নজরুল অধ্যায়টি অনেক দীর্ঘ। সে-সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এ নয়। শ্রীমজনীকান্ত দাসের সঙ্গে নজরুলের প্রথম মুখোমুখি পরিচয় কি ভাবে হ’য়েছিল আমি শুধু সেই কথাটি এখানে জানালাম। তিনি নজরুলের নিকটে তার ভক্তরূপে নিজের আত্ম-পরিচয় দিয়েছিলেন। এটা কি তাঁর বিনয় প্রকাশ ছিল, না, সত্যিই তিনি নজরুলের ভক্ত ছিলেন তা তিনি নিজেই বলতে পারেন।

শ্রীযুক্ত গিরিবালা দেবী

আমার এই স্মৃতিকথায় শ্রীযুক্ত গিরিবালা দেবীর নাম অনেক বার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তিনি নজরুলের শাশুড়ী। নজরুল তাঁকে ডাকত মাসী-মা। তা থেকে তিনি নজরুলের বন্ধু মাত্রেয়ই মাসী-মা হয়েছিলেন। তিনি বাঙলা মাসিক পত্রিকার লেখিকা ছিলেন না বটে, কিন্তু বাঙলা তিনি ভালোই লিখতেন। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল অসীম। নজরুলের কাব্য-সাধনার তিনি পরম উৎসাহদাত্রী ছিলেন। সে কয়েক দিন বাইরে থাকার পর বাড়ী ফিরে এলে এই ক’দিনে সে কি লিখেছে এবং কি শিখেছে তা তিনি জানতে চাইতেন। নজরুলও তাঁকে জানাত যে কি কি কবিতা সে এই ক’দিনে লিখেছে এবং কোন্ কোন্ গানের স্বরলিপি সে আয়ত্ত করেছে। নজরুলের বন্ধুদেরও তিনি আদর-যত্ন করতেন। তাঁরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

সেকালে আবদুল হালীম আর আমি প্রায়ই একত্রে থেকেছি। আমাদের যদিও কিছু করার ক্ষমতা ছিল না তবুও আমরা শ্রীযুক্ত গিরিবালা দেবীর স্মৃতি-অস্মৃতি প্রতি নজরুল রাখতাম। তিনি হয় তো তা বুঝতেন। তাই কখনও অস্মৃতি ঘটলে তিনি আমাদের মাঝে মাঝে চিঠি লিখে ডাকতেন।

নজরুলের ছেলে বুলবুল তার বন্ধুদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল। শিশুদের এড়িয়ে চলা আমার চিরদিনের অভ্যাস। কারণ, তাদের আকর্ষণ করার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এই আকর্ষণের নিকটে আমি কখনও ধরা দিতে চাইনি। কিন্তু শিশু বুলবুল যে আমাকেও তার আয়ত্তের ভিতরে নিয়ে এসেছিল তা আমি

বুঝেছিলাম পরে। ওঁদের পান বাগান লেনের বাসায় গিয়ে ফিরে আসার সময়ে সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে দোতারা হাতে নীচে নেমে আসত এবং গেটের কাছে এসে বলত “জ্যেষ্ঠা মশায়, আবার এসো।” মীরাট জেলে আমি যখন বিচারাধীন বন্দী তখনই শুধু আমি টের পেলাম শিশু বুলবুলের স্নেহের নিকটে আমি কতখানি ধরা দিয়েছি। আমার মনে হতো কতকাল পরে আবার কলকাতায় ফিরতে পাব কে জানে? তখন বুলবুল কি আমায় চিনতে পারবে?

বুলবুল কখন যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল সে-খবর কেউ আমায় দেয়নি। হঠাৎ একদিন আবদুল হালীমের ছোট ভাইয়ের লেখা একখানা পত্র পেলাম যে নজরুলের বুলবুল আর নেই। আমার মনের কি অবস্থা হয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কিঞ্চিৎ সামলে নেওয়ার পরে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীকে আমি একখানা পত্র লিখেছিলাম। নজরুল কিংবা প্রমীলাকে কোনো কিছু লেখার কথা আমি ভাবতেও পারিনি। ওঁদের বাড়ীর তিন জন লোক—গিরিবালা দেবী, নজরুল ও প্রমীলা—প্রত্যেকেই আপন মনে গুমরাচ্ছিলেন। কিন্তু কেউ কারুর নিকটে কোনো কিছু প্রকাশ করতে পারছিলেন না। ফিরে আসার পরে আমিও কোনো দিন নজরুল কিংবা প্রমীলার নিকটে বুলবুলের কথা তুলিনি। অনেক বছর পরে একদিন শুধু প্রমীলাকে বলেছিলাম যে অনিরুদ্ধ (ওঁদের ছোট ছেলে) দেখতে খানিকটা বুলবুলের মতো হয়েছে।

বুলবুলের মৃত্যুর পরে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর সহিত যখন আমার দেখা হলো তখন তিনি আমায় একান্তে পেয়ে খুব কঁাদলেন। বললেন, “বাবা, আমি আর কিছুতে মন বাঁধতে পারছি না। মাঝে মাঝে তোমার পত্রখানা বাঁর করে পড়ি। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারি না। আমি কোথাও চলে যেতে চাই। ওরা আমায়

যেতে দিচ্ছে না।” সেই থেকে তার মনে তীর্থবাসিনী হওয়ার ঝোঁক চেপেছিল। কয়েক বছর পরে একদিন তিনি সত্য সত্য চলেও গেলেন, কোথায় যে গেলেন সে খবরও দিলেন না। আজ তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই।

বুলবুলের মৃত্যুর কিছুকাল পরে নজরুল মোটর গাড়ী কিনেছিল এবং কিনেছিল তার “অগ্নিবীণা”র স্বত্ব বিক্রয় ক’রে। সে-সময়ে মোটর গাড়ীর দাম সস্তা ছিল। পেট্রোলের দামও ছিল সস্তা। ড্রাইভারের মাইনাও ছিল কম। এই সব কিছু বিবেচনা করলেও নজরুলের পক্ষে মোটর গাড়ী কেনা ছিল হঠকারিতা। পরে নজরুল নিজেই আমার নিকটে এই কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় ক’রে নজরুল কেন মোটর গাড়ী কিনতে গেল? এর পেছনে একটি ভাবপ্রবণতার ব্যাপার আছে।

কেন জানি না, বুলবুল মোটর গাড়ী বড় ভালোবাসত। মোটরের হর্ণের আওয়াজ কানে এলেই সে রাস্তার দিকে ছুটে যেতো। অনেক সময়ে আমরা কিছু পয়সা জোগাড় ক’রে তাকে ট্যাক্সিতে চড়িয়েছি। পুত্রের মোটর চড়ার আকাঙ্ক্ষা নজরুলের মনে গেঁথে ছিল। তাই সে তার মরার পরেও ওই ভাবে গাড়ী কিনেছিল। হয়তো তার পুত্র-স্মৃতির তাতে কিছু তৃপ্তি সাধন হয়েছিল। নিতান্তই ভাবালুতার ব্যাপার। তার মনে ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে পরের ছেলে দু’টিও হয়তো বাঁচবে না। সে আবার হাত দেখতে জানত। এই জন্মে আমি তাকে একদিন খুব ব’কেছিলাম। বলেছিলাম, “হাত দেখা যদি তোমার নেশা হয়ে থাকে তবে বত খুশী অগ্নদের হাত তুমি দেখতে পার। কিন্তু নিজের ছেলেদের হাত তুমি কিছুতেই দেখতে পাবে না।”

মাঝে মাঝে আমায় দীর্ঘ কালের জন্য অনুপস্থিত থাকতে হয়েছে ফিরে এলে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী নজরুলের কাব্য-সাধনা সম্বন্ধে

ও অগ্ন্যাগ্নি বিষয়ে মোটামুটি আমায় সব খবর দিতেন। তিনিই আমায় নজরুল সম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌হাল রাখতেন। তিনি আমায় জানিয়েছেন, নজরুলের গীতি-নাট্য “আলোর” গানগুলি প্রথমবারে চুরি হয়ে যায়। তার পরে সব গানই নজরুলকে আবার নূতন করে লিখতে হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) অনুরোধ করেছিলেন যে, শ্যামা বিষয়ক গান লিখে দিতে হবে, তিনি গাইবেন। তার জন্তে নজরুলকে শ্যামা বিষয়ক গান লিখতে হয়েছে। “চৌরঙ্গি” ছবির ব্যাপারে ফজলী ব্রাদার্সের জন্তে কঠোর পরিশ্রম করতে গিয়েই নজরুলের অসুখটা দেখা দিল। তাঁরা সব টাকাও নজরুলকে দেননি। নজরুলের অল্প টাকার অনেকগুলি দেনা হয়েছিল। শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত বললেন, তোমায় এসব উৎকর্ষ হতে বাঁচাতে হবে। তাই তিনি এক সঙ্গে নজরুলকে কয়েক হাজার টাকা ধার দিলেন। বন্ধক রাখলেন তার গানের রয়ালটি ও কি কি সব পুস্তক। একটি সভায় বলতে উঠে নজরুলের মুখ দিয়ে আর কথা বের হচ্ছিল না। তখন শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সভায় উপস্থিত ছিল) ঘোষণা করল যে কবি অসুস্থ। কবির বর্তমান ব্যাধির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল এই সভায়। অমনিতে তো নজরুল বাইরে কোথাও গেলে বাড়ীর কথা ভুলে যেতো। ছেলের জন্তে যে তার কোনো টান আছে তাও বোঝা যেতো না। কিন্তু বুলবুল অসুখে পড়ার পরে শেষ দিন পর্যন্ত নজরুল তার শয্যা-পার্শ্ব ত্যাগ করেনি। বুলও তার বাবাকে কোথাও যেতে দেয়নি। এই রকম অনেক সব খবর শ্রীযুক্ত গিরিবালা দেবী আমাকে দিতেন।

নজরুল রোগাক্রান্ত হওয়ার পরে কী যত্ন ও সেবা যে গিরিবালা দেবী করেছেন তা প্রকাশ করা কঠিন। শুধু নজরুলও তো নয়। তাঁর একমাত্র সন্তান প্রমীলাও উত্থান-শক্তিহীনা হয়ে বছরের পর বছর বিছানায় পড়ে আছে। সব কিছুই তিনি অগ্নান বদনে সামলে নিয়েছেন।

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর বাধ'কা যত বাড়ছিল ধার্মিক কৃচ্ছ'তাও তাঁর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছিল। কঠোর উপবাস ইত্যাদি তিনি করতেন। গঙ্গার জন্তো উদ্ভর কলিকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না। এই সব সম্বন্ধেও আমি ভেবে আশ্চ'র্য হয়ে যাই কি ক'রে তিনি সব কিছু ছেড়ে চ'লে গেলেন! আমি তাঁকে নিকট থেকে দেখেছি। যতই ধার্মিক কৃচ্ছ'তা তাঁর বাড়ুক, অনুদার তিনি কখনও হন নি।

“পথের দাবী”তে “লাঙলের গান”

“লাঙল” কাগজের প্রচার শুরু হওয়ার সময়েও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “পথের দাবী” মাসিক পত্রে (“বঙ্গবাণী”তে) ছাপা হচ্ছিল। তার পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে শ্রীশরৎচন্দ্র তাঁর বিশিষ্ট চরিত্র “সব্যসাচী”র মুখ দিয়ে লাঙলের গান সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। “পথের দাবী”র কবি আর কবি নজরুল ইসলাম এক ধরনের কবি নয়। তবুও অনেকে ধরে নিলেন নজরুল ইসলাম ছাড়া শরৎচন্দ্রের কটাক্ষিত কবি আর কেউ নয়। কাগজে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র নিজেও কিছু বললেন না। “লাঙল”-এর প্রকাশকে অনেকেই ভালো চোখে দেখতেন না। জমিদারদের তো কথাই নেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও তো জমি হ’তে বে-রোজগারের কড়ি কিছু কিছু হজম করতেন। তাঁরাই আবার রাজনীতিতে অগ্রণী ছিলেন। তাঁরাই সাধারণভাবে, বিশেষভাবে “ধূমকেতু”র সময়ে, নজরুলের লেখা হ’তে প্রেরণা লাভ করতেন। কিন্তু কৃষকের দাবী নিয়ে সংগ্রাম করলে তাঁদেরও স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত বেধে যায়। তাই শরৎচন্দ্রের মন্তব্য ছাপা হওয়ার পরে তাঁরা ভাবলেন, এতেই নজরুলকে তাঁরা ঘায়েল ক’রে দিবেন, আর শুধু নজরুলকেই বা কেন, “লাঙল”-এর পেছনে যাঁরা আছেন তাঁদেরও। যে-সে লোক তো নয়, স্বয়ং শরৎচন্দ্রের কলম থেকে মন্তব্য বের হয়েছে !

সব্যসাচীর মুখ-নিঃসৃত শরৎচন্দ্রের কথা সত্যই বিতর্কমূলক ছিল। আমরা এ-সম্বন্ধে আমাদের কাগজে লিখব কিনা যখন ভাবছিলাম তখনই ডাকঘোণে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (বিখ্যাত নাটক রচয়িতা)

একটা লেখা পেলাম। তাঁর লেখার প্রত্যেক ছত্রের সঙ্গেই যে আমাদের মতের মিল ছিল তা নয়, তবুও তাঁর লেখাই আমাদের নিকটে যথেষ্ট বিবেচিত হলো। আমরা তা “গণবাণী”তে ছেপে দিলাম। তখনও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, কিন্তু নজরুল ইসলামের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও হৃদয়তা ছিল। তাঁর পুরো লেখাটা “গণবাণী” হ’তে আমরা নীচে তুলে দিলাম। শরৎচন্দ্র তো কয়েকটি শব্দের সন্নিবেশ মাত্র করেছিলেন, কিন্তু একটি সময়ের শিক্ষিতদের চিন্তাসূত্রের পরিচয় তাতে পাওয়া যায়। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উল্লেখিত ‘তারার’র পুরো নাম শ্রীতারানাথ রায়। তিনি মুসোলিনির ছোট্ট জীবনী লিখেছিলেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তার ভূমিকায় লিখেছিলেন, মুসোলিনি দেশপ্রাণতার অবতার। “আত্মশক্তি” বিপ্লবী শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাগজ ছিল। তিনি সেই সময়ে “কংগ্রেস কর্মী-সঙ্ঘের” নেতা ছিলেন এবং “কংগ্রেস কর্মী-সঙ্ঘ” ছিল “সন্ত্রাসবাদী” বিপ্লবীদের একটি সংগঠন।

“লাঙলের গান”

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

“শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর “পথের দাবী” উপন্যাসে সব্য-
সাচাকে দিয়ে বলিয়েছিলেন :—

‘অশিক্ষিতের জন্ম অন-সত্র খোলা যেতে পারে, কারণ তাদের
ক্ষুধাবোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেশন করা যাবে না। তাদের
সুখ দুঃখ বর্ণনা ক’রবার মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোন দিন
যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য তারাই ক’রে নেবে, নইলে তোমার
গলায় লাঙলের গান লাঙলধারার গীতিকাব্য হয়ে উঠবেন। এ
অসম্ভব প্রয়াস ভুমি ক’রো না কবি।’

কথাটা সবই মিথ্যা নয়—কিন্তু ওর সবখানিই কি সত্য ?
বইখানি পড়বার সময় এই প্রশ্নই মনে জেগেছিল। এবার যখন
দেখলুম “আত্মশক্তি”র ‘তারারা’ সব্যসাচীর এই অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে
নজরুলকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করেছেন, তখন কথাটা আলোচনা
ক’রে দেখবার লোভ হলো। ‘তারারা’কে আমার অনুরোধ যে তিনি
যেন এই আলোচনা তাঁর মন্তবোর প্রতিবাদ ব’লে মনে না করেন।
তাঁর সঙ্গে নজরুলের যে কাণ্ডজে লড়াই চলেছে, তাতে কোন পক্ষ
অবলম্বন করবার ইচ্ছা আমার নেই। নিরপেক্ষ থেকেই ও লড়াই
আমি উপভোগ করছি—কেননা দু’জনাই আমার বন্ধু। মুখে তাঁরা
যে বাই-ই বলুন, তাঁদের মনের খবর আমি কিছু রাখি—কাজেই
লড়াই-এর ফলাফল ভেবে কারুর জন্ম শঙ্কিত হয়ে উঠবার কোন
কারণ নেই। কেউ যে খুনে হবেন না, সে সম্বন্ধে আমি এক রকম

নিশ্চিন্ত। এখন সব্যসাচীর কথাই আলোচনা করা যাক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সব্যসাচী যাকে উপদেশ দিয়েছেন সে আর কিছু নয়—কেবল কবি। নদীর ধারে বন-বাদাড়ের ভিতর তার থাকবার ঘর। সে যখন তখন বেহালা বাজায়, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, মদ যেমন খায়, তেমনি এক কথায় ছেড়ে দিতে পারে, নিশ্চিত প্রাপ্য টাকার আশায় সে বে-পরোয়া ধার করে, নবতারাকে বিয়ে ক’রে একখানি বাড়ী কিনে সুখে শাস্তিতে দিন যাপন করবার কল্পনাও বেশ রঙীন হয়ে তার মনকে আচ্ছন্ন ক’রে ফেলে। এহেন যে কবি তাকে সব্যসাচী নিশ্চিন্তই এ উপদেশ দিতে পারেন যে সে যেন লাঙলের গান না গেয়ে সাহিত্য রসিকদের জন্মই সঙ্গীত রচনা করে। সে তো নিজেই সব কাজ ছেড়ে দিয়ে বেহালাকে বুক করে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁরা লাঙলের গান গাইছেন, তাঁরা তো জীবনকে ঠিক ওই ভাবে মেনে নেননি—ও গান তাঁদের বুক ঠেলে কণ্ঠ দিয়ে যে বেরুচ্ছে তা নিশ্চিতই গীতিকাব্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়। চৈতন্যদেব যখন গান গেয়ে গেয়ে দেশ মাতিয়েছিলেন, রাজপুত্র চারণ কবির যখন গাইতেন তখন কি কবি-যশপ্রার্থনা তাঁদের মনের কোণেও ঠাঁই পেয়েছিল? গান গাইবার একমাত্র সার্থকতা কি গীতিকাব্য সৃষ্টিতে? তা ছাড়া আর কিছুই কি নেই? আছে। আছে বলেই তো চৈতন্যদেব পেরেছিলেন বাঙালীকে মহাশক্তির পরশে জাগরিত করতে, আর সেই স্পর্শে বাঙালী সঞ্জীবিত হয়েছিল বলেই তো অণু জিনিস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিকের সব চেয়ে বড় সম্পদ বৈষ্ণব কাব্য গড়ে উঠেছে। অথচ কাব্য সৃষ্টি চৈতন্যদেবের লক্ষ্য ছিল না।

আমাদের দেশের লাঙলের গান গায়কদের সব্যসাচীর ওই কথা শুনিয়েই যাঁরা বলতে চান যে ‘লাঙলের গান’ লাঙলধারার গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না, তাঁদের একথা মনে করিয়ে দিলে বোধ হয় অনায়াস

হবে না যে, সাহিত্যিকের চেয়েও অনেক বড় জিনিসের দাবী যুগে যুগে মানুষের ভিতরকার সঙ্গীতের উৎস খুলে দিয়েছে, আর তারই কিছু কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করবার শক্তি লাভ করেই সাহিত্য ধন্য ও পবিত্র হয়েছে, এমন কি তার নিজের নাম অবধি পেয়েছে।

অশিক্ষিতের ক্ষুধা বোধ আছে, কাজেই তাদের জন্য অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, একথা যিনি বোঝেন, তাঁর একথাটাও বোঝা উচিত যে অশিক্ষিতের ক্ষুধা বোধই শিক্ষিত ধনিকের অর্থ দানের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে না, আর অর্থ না হ'লে অন্নসত্রও খোলা চলে না। সব্যসাচী সে কথাটা ভুলে গেলেও, লাঙলের গান যাঁরা গাইবেন বা ছুনিয়ায় যাঁরাই গেয়ে থাকেন—তাঁরা তা ভুলতে পারেন না, আর তা পারেন না বলেই অশিক্ষিতদের বেদনা সাহিত্যে জন্মিয়ে ভুলে শিক্ষিতদেরই তা পরিবেশন করেন। আর তারই ফলে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত অশিক্ষিতদের শিক্ষিতেরা আর তেমন করে উপেক্ষা, তেমন করে অবজ্ঞা করতে পারেন না যা বংশানুক্রমে গোষ্ঠী পরম্পরায় তাঁরা ক'রে এসেছেন। লাঙলের গান কোন গাইয়েই, অশিক্ষিতদের জন্য কখনো গাননি—গেয়েছেন শিক্ষিতদের জন্যই। আর অশিক্ষিতদের যে সাহিত্য পরিবেশন করা চলে না, এ জ্ঞান সব্যসাচীর চেয়ে লাঙলের গান গাইয়েদের ভালো জানবার কথা—কারণ লাঙলের গান গাইয়েদের কাছে অশিক্ষিতরা কল্পলোকে থাকে না আইডিয়া প্রধান সব্যসাচীর কাছে যেমন রয়েছে।

অশিক্ষিতদের সুখদুঃখ বর্ণনার মানাই তাদের সাহিত্য নয়। এ কথাটা খুবই সত্য। আমি আগেই বলেছি সাহিত্য সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে লাঙলের গান গাইয়েরা গান করেন না। সুতরাং এ উপদেশ তাঁদের দিয়ে কোন লাভই নেই ;—যেহেতু যা সাহিত্য নয় তাই-ই তাঁরা অকেজো মনে করেন না। আর অশিক্ষিতদের সুখদুঃখের বর্ণনা 'তাদের' সাহিত্য না হতে পারে, কিন্তু দেশের

সাহিত্য নিশ্চিতই হ'তে পারে। সমাজের পতিতদের সুখদুঃখের বর্ণনা কেন না সাহিত্য হবে? পতিতারা নারী ব'লেই তাদের দাবী, পুরুষ ও নারীর মিশ্রিত পতিত জনসঙ্ঘের দাবীর চেয়ে কি কারণে বেশী হবে? নারীর সঙ্গে পুরুষও রয়েছে ব'লে কি বাগ্‌দেবীও বিমুখ হবেন?

‘কোন দিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য তারাই গড়ে নেবে’— লাঙলের গান গাইয়েদের কাছে ওই সম্ভাবনার সংবাদ মোটেই দুঃসংবাদ নয়। সে-গান যত শীঘ্র সম্ভব তারা যাতে গাইতে পারে তার জন্য লাঙলের গান গাইয়েদেরই তো আগ্রহের অন্ত নেই। ওই আগ্রহই তো তাঁদের জীর্ণ পাঁজর ক'খানি কাঁপিয়েও তাঁদের দিয়ে লাঙলধারার গান গাওয়াচ্ছে। এ কথাটি ভুলে চলবে কেন?

তারপর অশিক্ষিতেরা নিজেদের প্রয়াসেই কেবল তাদের সাহিত্য গড়তে পারবে না। যদি কোন দিন তারা তাদের সাহিত্য গড়ে তোলে সেদিন আর তারা অশিক্ষিত থাকবে না, আর অশিক্ষিত থেকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে উন্নত হ'তে হ'লে শিক্ষিতদের সাহায্যই বেশী দরকার হবে। লাঙলের গান গাইয়েরা সে কথা বোঝেন বলেই তো শিক্ষিতদেরই আগে তৈরী করছেন। অশিক্ষিতদের সাহিত্য যে একেবারেই থাকতে পারে না একথা আমি বলছি না। আমাদের দেশেও আছে—কিন্তু সে সাহিত্যের মশলা জুগিয়েছে শিক্ষিতরা। মানুষ হবার গান কোন জাতির কাছেই কোন দিন নিরর্থক হয়নি। ধরণীর বুকে যে জাতি যখনই মানুষের মত বেড়ে উঠেছে তখনই সেই জাতিকে মানুষ হবার গানই গাইতে হয়েছে। সে গানের সুর আপনি ফুটে বেরাবে, এই আশা নিয়ে আইডিয়েলিস্ট ব'সে থাকতে পারেন—কিন্তু স্বয়ং ভগবান যখন তা পারেন নি, না পেরে যুগে যুগে মানুষের রূপ নিয়ে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে যখন মানবের মনে মনে মুক্তির বীজ বপন করে'ছেন, তখন কর্মীই বা কেমন ক'রে ‘দিন গুণে আর পথ চেয়ে’ বসে থেকে

কেবল আইডিয়াই আয়ত্ত করবে? আর যে কর্মী সে গান গাইতে পারবে না, সাহিত্যিকের এমন নিষেধ কোন কর্মীই কোন দিনই মেনে চলেনি, চলবেও না, কেননা সে গান গায় আপন প্রয়োজনে, সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়ে নয়।” (“গণবাণী” ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬, মূর্তাবিক ৬ই আশ্বিন, ১৩৩৩) ।

লেখার স্বত্ব বিক্রয়

নজরুল ইসলাম তার বেশীর ভাগ পুস্তকের স্বত্বাধিকার কোন না কোন সময়ে বিক্রয় ক'রে দিয়েছিল। পারিবারিক অভাবের তাড়নাতেই সে এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে বন্ধুদের সাহায্য করার জন্তও সে দু' একবার তার পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করেছে। আর, যাঁরা স্বত্ব কিনেছেন তাঁরা তার অভাবের পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে ভোলেন নি।

নজরুলের পুস্তকের স্বত্ব যাঁরা কিনেছেন তাঁদের মধ্যে ডি. এম. লাইব্রেরীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই লাইব্রেরীর মালিক শ্রীগোপাল দাস মজুমদারের সহিত নজরুলের পরিচয় আগে হ'তেই ছিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রথম ব্যবসায় সংক্রান্ত কথাবার্তা সে নিজে চালায়নি। শ্রীহেমন্তকুমার সরকারই সর্বপ্রথম এই কথাবার্তা চালান। তার ফলে ডি. এম. লাইব্রেরী নজরুলের পুস্তকের প্রকাশক হয়, কিন্তু একমাত্র প্রকাশক নয়। এটা ১৯২৬ সালের শুরুর দিককার কিংবা ১৯২৫ সালের শেষ দিককার কথা। ডি. এম. লাইব্রেরী হ'তে যখন নজরুলের বই প্রকাশ হওয়া শুরু হলো তখন মালিক শ্রীগোপাল দাস মজুমদার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন যে তিনিই তার পুস্তকগুলির একমাত্র প্রকাশক হবেন। অন্য কেউ নজরুলের লেখাগুলি প্রকাশ করুন এটা শ্রীমজুমদার কিছুতেই সহ্য করতে চাইতেন না। ধীরে ধীরে তিনিই একমাত্র প্রকাশক না হ'লেও নজরুলের বেশীর ভাগ পুস্তকের প্রকাশক হয়ে পড়লেন।

তখনকার দিনে প্রকাশকরা দু'এক জন লেখক ছাড়া আর সব লেখককে অল্প অল্প ক'রে টাকা দিতেন, বেশী টাকা কখনও এক সঙ্গে

দিতেন না। কাজেই লেখকদের পাওনা মিট্‌তে না কিংবা মিট্‌তে দেৱী হতো। শ্ৰীগোপাল দাস মজুমদারের সহিতও নজরুলের এইরূপ পাওনা না মেটানোর ব্যাপার ঘটেছিল। একবার শ্ৰীনিমল চন্দ্র সলিসিটর হিসাবে নজরুলের পক্ষ হ'তে ডি. এম. লাইব্রেরীকে পত্ৰও লিখেছিলেন। তারপরে, পাওনার হিসাব হয়েছিল, সম্ভবত পাওনা মেটানোও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত লাভ হয়েছিল ডি. এম. লাইব্রেরীরই। কিছু দিন পরে শোনা গেলো নজরুল ইসলাম তার 'অগ্নিবীণা'র স্বত্ব মাত্র দু' হাজার টাকায় বিক্রয় ক'রে দিয়েছে। যাঁরা কিনেছেন তাঁরা শ্ৰীগোপাল দাস মজুমদারের বন্ধু।

নজরুল ইসলামের পুস্তকগুলির মধ্যে "অগ্নিবীণা"র বিক্রয় সর্বাপেক্ষা বেশী। এই পুস্তকের প্রথম মুদ্রণ হয়েছে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) কার্তিক মাসে। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের (১৯২৮) শ্রাবণ মাসে 'অগ্নিবীণা' চতুর্থ বার মুদ্রিত হয়েছে। এই চার বারে মোট পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে ৮৬০০ খানা। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের (১৯৫৬) বৈশাখ মাসে 'অগ্নিবীণা' পঞ্চদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। তার পরে পুস্তকখানা আরও একবার মুদ্রিত হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। দীর্ঘ কাল হতে 'অগ্নিবীণা' প্রতি মুদ্রণে দু' হাজার কিংবা দু' হাজার দু'শ আর ছাপা হচ্ছে না, ছাপা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। 'অগ্নিবীণা'র স্বত্বাধিকার বিক্রয়ের পরে ডি. এম. লাইব্রেরীর নিকটে নজরুল ইসলামের আরও অনেক পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় হয়ে গেছে, এবং নিশ্চয় উচ্চ মূল্যে নয়।

"রক্তের বেদন" ও আরও দু' খানা পুস্তকের স্বত্ব মাত্র চার শ' টাকায় অন্য একটি ফার্মের নিকটে নজরুল বিক্রয় ক'রেছিল। "ব্যথার দান" নামক গল্প পুস্তকখানার স্বত্ব মাত্র এক শ' টাকায় আফ্‌জালুল হক সাহেব কিনে নিয়েছিলেন। আফ্‌জাল সাহেবের সঙ্গে নজরুলের যে সম্পর্ক ছিল তাতে দর-দস্তুর করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আফ্‌জাল সাহেব যা দিয়েছেন নজরুলকে তাই নিতে হয়েছে।

নজরুল ইসলাম শুধু যে স্বহস্তে বিক্রয় করেছে তা নয়, সে তার পুস্তক ও গানের স্বহস্তে বন্ধকও রেখেছে। কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে অনেক কিছু বন্ধক রেখে সে টাকা ধার করেছিল। টাকার পরিমাণ আমি জানি না, তবে শুনেছি চার হাজার টাকা। এই বাঁধা দেওয়া স্বহস্তের মধ্যে ছিল নজরুলের গানের পুস্তক ও অগাধ পুস্তক। তা ছাড়া, গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাওয়া নজরুলের গানের রয়ালটিও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বন্ধক হওয়ার পর হ'তে এই সব কিছুর আয় শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত পাচ্ছিলেন। কি রকম দলীল সম্পাদিত হয়েছিল, কি কি তার শর্ত ছিল তার কিছুই আমি জানি না। এটা একটা খাই-খালাসী ধরনের বন্ধকী দলীল ছিল কিনা নজরুলের বন্ধুদের মধ্যে কেউ তা বলতে পারছেন না। মোটর ওপরে, নজরুল ইসলামের অনেক বই আর ছাপা হচ্ছে না, তার গানগুলি তো একেবারেই বিলুপ্ত হতে বসেছে।

কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে এক দিক হ'তে নজরুল ইসলাম ভাগ্যবান। সে ভারত ও পাকিস্তান এ দুই রাষ্ট্র হ'তেই সাহিত্যিক বৃত্তি পায়। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীর তহবীল হ'তে সে যেমন সাহিত্যিক পেন্সন পায় তেমনই সে সাহিত্যিক পেন্সন পায় পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের নিকট হতেও। কিন্তু নজরুল ইসলাম ভারত রাষ্ট্রের বাসিন্দা। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের তার সম্বন্ধে আরও দায়িত্ব আছে। নজরুল যখন আজ অশক্ত, নির্বাক ও সম্বিতহারা তখন তার লেখাগুলি যাতে বিলুপ্ত না হয় (বন্ধকী লেখাগুলি বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে) তা দেখা রাষ্ট্রের কাজ। যাঁরা নজরুলের পুস্তকের স্বহস্তে কিনেছেন ও বন্ধক রেখেছেন তাঁরা অনেক লাভ ক'রে নিয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয় আপত্তি করতে পারেন না যদি রাষ্ট্র এগিয়ে এসে একটি ট্রাস্ট গঠন ক'রে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে কাজী নজরুল ইসলামের

পুস্তকগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। দরকার হ'লে গভর্নমেন্ট বিশেষ আইনও প্রণয়ন করতে পারে। একজন বিশিষ্ট কবির জন্য এই রকম করাটা গবর্নমেন্টের পক্ষে অশোভন কাজ হবে না। শুনেছি উত্তর প্রদেশের কবি 'নিরালা'র জন্য সে প্রদেশের গবর্নমেন্ট এই ধরনের কি একটা ব্যবস্থা করেছেন। কবির অনেক পুস্তক তো প্রকাশিত হচ্ছেই না, আর যে সব পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে সে-সব পুস্তকেও কিছু কিছু ভুল ছাপা হওয়া শুরু হয়েছে। বাঙলার কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলামের লেখা খুব ভালো বিক্রয় হয়। ছেপে দিলেই বইগুলি যখন বিক্রয় হয়ে যায় তখন নিভুল ছাপা হলো কি না সেদিকে প্রকাশকরা তেমন নজর দেন না। ০

বিশেষ বিশেষ কবিতা ও গান রচনার

উপলক্ষ

নানা উপলক্ষে নজরুল ইসলামকে নানা গান ও কবিতা রচনা করতে আমরা দেখেছি। অনেক সময়ে অপরের ফরমায়েশেও সে গান ও কবিতা রচনা করেছে। লেখার উপলক্ষ আমার জানা আছে এমন কয়েকটি গান ও কবিতা রচনার সম্বন্ধে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আরও কয়েকটি গান ও কবিতা কোন্ উপলক্ষে রচিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমি এখানে বলব।

নজরুল ইসলামের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচারিত কবিতা পুস্তক “অগ্নিবীণা” শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষকে নিম্নলিখিত গানে উৎসর্গ করা হয়েছে

“অগ্নি-ঋষি ! অগ্নি-বীণা তোমার শুধু সাজে ।
তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে ॥
দহন-বনের গহন চারী—
হায় ঋষি—কোন বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি
অগ্নি-মরুর মাঝে ।
সর্বনাশা কোন্ বাঁশী সে বুঝতে পারি না যে ॥

দুর্বাসা হে রুদ্র তড়িত হান্ছিলে বৈশাখে
হঠাৎ সে কার গুনলে বেগু কদম্বের ঐ শাখে ।
বজ্রে তোমার বাজল বাঁশী,
বহ্নি হ’ল কান্না হাসি,
স্বরের ব্যাখার প্রাণ উদাসী
মন সরে না কাজে ।
তোমার নয়ন-ঝরা অগ্নি-স্বরেও রক্ত-শিখা রাজে ॥”

“অগ্নি-বীণা” প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালের শেষ ভাগে (কার্তিক, ১৩২৯), আর এই গানটির রচনাকাল ১৯২০ সাল। নজরুল ইসলাম তখন আমার সঙ্গে চ-এ, টার্নার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকত। বাঙলার সাহিত্য-জগতে নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়কে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষেরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁদের হাতে দু’খানা কাগজ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মাসিক পত্র “নারায়ণ”-এর পরিচালনা-ভার তাঁদের ওপরে অর্পিত ছিল, আর বাঙলা সাপ্তাহিক “বিজলী” ছিল তাঁদের নিজেদের কাগজ। এই দু’খানা কাগজেই নজরুলের লেখার অংশ বিশেষ তাঁরা মাঝে মাঝে ভুলে দিয়ে তার ওপরে খুব ভালো মন্তব্য করতেন। অবশ্য, তাঁদের সঙ্গে নজরুলের চাক্ষুষ পরিচয় তখনও হয় নি। আমি আগেই বলেছি “সদ্বাসবাদী” বিপ্লবীদের ওপরে নজরুলের শ্রদ্ধা ছিল। সেই দিক থেকে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষের ওপরে তার শ্রদ্ধা ছিল সর্বাধিক।

কিন্তু, এই বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ যখন আন্দামান হতে ফিরে এসে তাঁর বৈষ্ণব কবিতার সংগ্রহ “দ্বীপান্তরের বাঁশী” নাম দিয়ে প্রকাশ করলেন তখন নজরুল মনে মনে আহত হলো। সে বৈষ্ণব কবি রূপে শ্রীবীরেন্দ্রকুমারকে কখনো কল্পনাও করেনি। তার মনের এই অবস্থাটি রূপায়িত হয়েছিল ওপরে ভুলে দেওয়া গানে। এই গানটি আসলে ছিল শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা নজরুল ইসলামের প্রথম পত্র। এই পত্রখানা শ্রীবীরেন্দ্রকুমারের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বারীন বাবুরা তখন মোহন-লাল ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে থাকতেন। পত্র পেয়ে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নাকি বলেছিলেন (এটা আমার শোনা কথা) “নজরুল ইসলাম মনে হচ্ছে আমায় গালই দিল।” নজরুল তো বারীনবাবুদের সঙ্গে মুখো-মুখি পরিচয়ের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েই ছিল, তার পত্রখানা হলো

সেই পরিচয়ের সূত্র। এই সূত্র ধরেই নজরুল একদিন সন্ধ্যার পরে মোহনলাল ষ্ট্রীটে উপস্থিত হলো। ফিরে এসে নজরুল আমায় বলেছিল, তারা যখন বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছাল তখন দেখা গেল নীচের ঘরে আলো জ্বলছে, সেখানে যে কথাবার্তা হচ্ছিল তারও আওয়াজ কানে আসছিল। কিন্তু যেই বাড়ীর লোকেরা টের পেলেন বাইরের লোক আসছেন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা আলো বুজিয়ে দিলেন এবং দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। অনেক লোক অসময়ে এসেও বিরক্ত করতেন বলে সম্ভবত তাঁরা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা নজরুলের ওপরে কাজ করবে কেন? সে এমন হৈ-হল্লা ও চৌকামেচি শুরু করে দিল যে তৎক্ষণাৎ ঘরে আলো জ্বলে উঠল, দরজাও খুলে গেল। সে দিন রাতে মোহনলাল ষ্ট্রীটে ঝড় বয়ে গেল। নজরুল যেখানেই যেতো চৌকিয়ে, হেসে, গান গেয়ে সেখানে ঝড় বইয়ে দিত। এর পরে অবশ্য বারীন বাবুদের সঙ্গে নজরুলের হৃদয়ত অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল। ১৯২২ সালে প্রকাশিত “অগ্নিবীণা” নজরুল ১৯২০ সালে লেখা গানের পত্রের মারফতেই শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করল। হয়তো পুস্তকের “অগ্নিবীণা” নামও নজরুল তার ১৯২০ সালে লেখা গান হতে গ্রহণ করেছিল।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষেদের সঙ্গে যখন নজরুল ইসলামের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন শ্রীনলিনীকান্ত সরকার “বিজলী”তে কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। নজরুল ইসলাম, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীদিলীপকুমার রায় এক সময়ে বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে এক সঙ্গে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য নজরুলকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি আমাদের বাসায়ও আসতেন। “বিজলী”তে ছাপাবার জন্য “বিদ্রোহী” কবিতার পাণ্ডুলিপি তিনিই আমাদের বাসা হতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভাঙার গান

অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে নজরুল ইসলাম তার “ভাঙার গান” শীর্ষক গানটি ছগলী জেলে থাকার সময়ে লিখেছে। মোটেই তা নয়। নজরুলের সাজা হয়েছিল ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে, আর “ভাঙার গান” লেখা হয়েছিল ১৯২১ সালে যখন দেশে জোর নিকুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন চলেছে। শত শত লোক তখন কারাবরণ করছিলেন। একদিন শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ (পরে ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ) “বাংলার কথা”র জন্য একটি কবিতা চাইতে আসলেন। “বাংলার কথা” দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাগজ ছিল। তিনি তখন জেলে ছিলেন। যতটা মনে পড়ে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তখন কাগজখানার সম্পাদন করতেন। শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ দাশ-পরিবারের লোক ছিলেন। দুর্ভাগ্য যে তিনি আর বেঁচে নেই। কবিতার জন্যে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল লিখতে বসে গেল। লেখা শেষ হওয়ার পরে সে আমাদের পড়ে শোনাল :—

(১)

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজোর পাষণ-বেদী !
ওরে ও তরুণ ঈশান !
বাজা তোর প্রলয়-বিষাগ !
ধ্বংশ-নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি !

(২)

গাজনের বাজ্‌না বাজা
কে মালিক ? কে সে রাজা !

কে দ্যায় সাজা

মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে ?

হা হা হা পায় যে হাসি,

ভগবান পরবে ফাঁসি ?

সর্বনাশী

শিখায় এ হীন তথ্য কে রে ?

(৩)

ওরে ও পাগলা ভোলা

দে রে দে প্রলয়-দোলা

গারদগুলা

জোরসে ধরে হেঁচকা টানে !

মার হাঁক হৈদরী হাঁক,

কাঁধে নে হুন্‌ডুভি ঢাক,

ডাক ওরে ডাক

মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে !

(৪)

নাচে ঐ কাল বোশেখী,

কাটাবি কাল বসে কি ?

দেরে দেখি

ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি !

লাথি মার ভাঙরে তাল !

যত সব বন্দী-শালায়—

আগুন জালা,

আগুন জালা, ফেল্‌ উপাড়ি !”

নজরুল ইসলাম এই গান রচনা করেছিল যখন দেশব্যাপী নিরুপদ্রব
 অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। অর্থাৎ আমার সঙ্গে কুমিল্লা হ'তে
 ফেরার পরেই সে গানটি লিখেছিল। এই গান হতে খুব পরিস্কার
 বোঝা যায় যে নিরুপদ্রব আন্দোলন কখনও নজরুলের হৃদয়-স্পর্শ
 করেনি। আশ্চর্য এই যে গানটি আবার তাঁদেরই কাগজে ছাপা হয়েছিল
 যাঁরা ছিলেন নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নজরুল ইসলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে খুব শ্রদ্ধা করত। অবশ্য, যাঁরা আমাদের বাসায় আসতেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের একজন ছিলেন না। নজরুলের সঙ্গে অন্য কোনও সাহিত্যিক আড্ডায় সম্ভবত তাঁর দেখা হতো। তাঁর চোখের সূক্ষ্ম তন্তুগুলি শুকিয়ে যাচ্ছিল। বেঁচে থাকলে তাঁর নাকি অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ ‘খাঁচার পাখী’ শিরোনাম দিয়ে একটি কবিতা লিখলেন। এই কবিতায় নৈরাশ্যের সুর ফুটে উঠেছিল। নজরুল ইসলাম কবিতাটি পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে ১৩২৮ সালের আশ্বিন মাসে (খ্রীষ্টীয় ১৯২১ সাল) ‘দিল্ দরদী’ শিরোনাম দিয়ে একটি কবিতা লিখল। এই কবিতার প্রথম ও শেষ শ্লোক নীচে তুলে দিচ্ছি :—

“কে ভাই তুমি সজল গলায়
গাইলে গজল আক্সোসের ?
ফাগুন-বনের নিবল আগুন
লাগল সেথা ছাপ পোষের।

✽

✽

✽

✽

বাদশা-কবি সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি !”

নজরুলের কবিতা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের হৃদয়-স্পর্শ করেছিল। তিনি নজরুলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাদের ৩৪-সি তালতলা

লেনের বাসায় এসেছিলেন। কিন্তু বড় দুঃখ যে আমরা কেউ তখন বাসায় ছিলাম না।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ পেয়েই নজরুল ইসলাম দৈনিক ‘সেবকে’ একটি ভাবপ্রবণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিল। সেদিন সন্ধ্যা বেলা কলেজ স্কয়ারের (এখন বঙ্কিম চাট্‌জো স্ট্রীট) ফুটু ডেপ্টস্ হল কিংবা মহাবোধি সোসাইটির হলে (এখন ঠিক মনে করতে পারছি না) একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সে দিনই নজরুল ইসলাম—

“চল-চঞ্চল বাণীর ছল্লাল এসেছিল পথ ভুলে”,

ওগো এই গঙ্গার কূলে।

দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে’

ওগো এই গঙ্গার কূলে।”



গানটি লিখে তাতে সুর সংযোজন করল। সন্ধ্যার শোক-সভায় এই গানটি সে গেয়েছিল। এটা ছাড়াও নজরুল সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কবিতা লিখেছে, কিন্তু এই গানটিই ছিল তার সত্যেন্দ্র-স্মৃতির প্রতি প্রথম অর্ঘ্য, অবশ্য সকাল বেলায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিকে বাদ দিলে।

“জাতের নামে বজ্জাতি”

একটি সভায় শ্রীমলিনাক্ষ সান্যালকে বলতে শুনেছি যে তাঁর বিয়েতে গিয়ে নজরুলকে ‘জাতের নামে বজ্জাতি’ শীর্ষক কবিতা লিখতে হয়েছিল। তাঁর বিয়েতে নজরুলের যাওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু তাঁর বন্ধুরা সেখানে নজরুলকে নিয়ে হাজির হলেন। ওখানে হিন্দু গোঁড়ামির আব-হাওয়া একান্তভাবে বিরাজ করছিল। নজরুল অপমানিত বোধ করতে পারে এই ভয়ে শ্রীসান্যাল এতটুকু হয়ে গেলেন। কি এক উপায়ে তাঁরা সব দিক রক্ষা করলেন, কিন্তু নজরুল ব্যাপারটি বুঝেছিল। সেখানে থাকার সময়েই সে লিখল :—

“জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।

ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে ন’য়ক মোয়া

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতে জাতির জান

তাইত বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশ’ খান।

এখন দেখিস্ ভারত জোড়া,

পড়ে আছিচ্‌ বাসি মড়া,

মাহুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্‌ছরা ॥”

১৩৩০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-সংখ্যক ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’র এই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। নজরুল তখন জেলে ছিল।

“পউষ”

নজরুল ইসলাম তখন কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে বিচারার্থী বন্দী। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে আরও

একজন ছিলেন। এখানে তাঁর নামোল্লেখ করব না। কারণ, তাঁর চাকরি চলে যেতে পারে। নজরুলের সঙ্গে আমরা দেখা করলাম। মধ্যখানে তারের বেড়ার ব্যবধান ছিল। ফিরে আসার সময়ে পথে আমার সাথী নজরুলের ‘পউষ’ শীর্ষক কবিতাটি আমায় দেখাল। তারের বেড়ার ছিদ্দের ভিতর দিয়ে কখন যে নজরুল কবিতাটি আমার সাথীর হাতে দিয়েছিল তার আমি কিছুই টের পাই নি। কবিতাটি ছিল :—

“পউষ এলো গো !

পউষ এলো অশ-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।

ঐ যে এলো গো—

কুজাটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে ॥” ইত্যাদি

যতটা আমার মনে পড়ে কবিতাটি ‘প্রবাসী’তে ছাপা হয়েছিল। তারপরে তা ‘দোলন-চাঁপা’ পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

“পথিক শিশু”

দেওঘরে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুর (কুমারী নাম কুমুদিনী মিত্র) সহিত নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। এই পরিচয়ের সুবাদে তিনি তাঁর মেয়ের জন্মদিনে নজরুলকে কলকাতায় তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই উপলক্ষে নজরুল লিখেছিল একটি গান :—

“নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।

কোন্ নামের আজ পরলি কাকন ? বাঁধন-হারার কোন্ কারা এ ?

আবার মনের মতন করে’

কোন্ নামে বল্ ডাক্বো তোরে

পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে

ছিলি ওরে, এলি ওরে বারে বারে নাম হারায়ে ॥

*

*

*

*

নজরুলের সংগ্রামশীল কবিতা ও গীতি কবিতা

কেন জানিনে অনেকে ভাবেন, নজরুল ইসলাম তার সংগ্রামশীল কবিতাগুলি লিখেছে এক যুগে এবং গীতি কবিতাগুলি লিখেছে অন্য এক যুগে। প্রকৃত কথা কিন্তু তা নয়। সব রকমের কবিতা ও গান সে একই সঙ্গে লিখে গেছে। অবশ্য, সে তার গজল গানের প্রবর্তন তার কাব্য জীবনের এক বিশেষ স্তরে করেছিল। নজরুলের যে কবিতা-গুলি তার বিভিন্ন কবিতা পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সে-গুলিতে যদি রচনার তারিখ দেওয়া থাকত তাহলে সহজেই বোঝা যেতো যে বিভিন্ন ধরনের কবিতা ও গান সে একই সময়ে লিখেছে। অর্থাৎ যখন সে “সব্যসাচী”র মতো কবিতা লিখেছে তখন সে খুব নিরীহ প্রেমের কবিতা আর গানও লিখেছে। তবুও নজরুলের অনেক সাহিত্যিক বন্ধুকে তখনও অভিযোগ করতে শুনেছি যে নজরুল গীতি কবিতা লিখল না, কি করে সে বেঁচে থাকবে সাহিত্য-জগতে? আসলে এই অভিযোগ ঘাঁরা করতেন তাঁরা চাইতেন না যে নজরুল সংগ্রামশীল কবিতা লিখুক।

জনগণের (জনতার নয়) একটা বিরাট অংশ চাইতেন যে নজরুল সংগ্রামশীল কবিতা রচনা করুক। নজরুল জনগণের মধ্য হতে এসেছে। সে বিদগ্ধ সমাজের সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরে নিজেকে আটকে রাখবে কি করে? নজরুল যে সব রকমের কবিতা ও গান একই সময়ে লিখেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিব। দৌলতপুর গ্রামে আলী আকবর খানের নিকট হতে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার পরে নজরুল ইসলাম কুমিল্লা শহরে এসে কয়েকদিন ছিল একথা আমি আগে বর্ণনা করেছি। এই

সময়ে তার কবিতা রচনায় বান ঢেকেছিল। আমি কয়েকটি গান ও
কবিতার প্রথম শ্লোক এখানে তুলে দিচ্ছি :—

মরণ-বরণ

এস এস এস ওগো মরণ !
এই মরণ-ভীতু মানুষ মেঘের ভয় কর গো হরণ ॥
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাদের বুকের পরে
ভীম রক্ততালে নাচুক তোমার ভাঙ্গন-ভরা চরণ ॥

বন্দী-বন্দনা

আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শূনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
এ কাহারো কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে ॥

পাগল-পথিক

এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায় ।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে ধায় ।
অধীন দেশের বান্দন-বেদন
কে এলো রে করতে ছেদন ?
শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শব্দ কে বাজায় ।

এই রকম আরও অনেক কবিতা সে ওই সময়ে লিখেছে। যে-
কবিতাগুলি ওই সময়ে লেখা সম্বন্ধে আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহেরও
উদ্বেক হয়েছে সেগুলির উল্লেখ আমি এখানে করিনি। নজরুলকে

কলকাতা নিয়ে আমার উদ্দেশ্যে আমি যেদিন কুমিল্লা পৌঁছেছিলাম তার পরের দিন ‘রথ যাত্রা’ ছিল। কুমিল্লায় জাঁকালো ‘রথ-যাত্রা’ হতো। নজরুল আর আমি শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একথানা ঘোড়ার গাড়িতে রথের মিছিল দেখতে বের হয়েছিলাম। তখন রাস্তার ছোট ছোট ছেলেরা নজরুলকে দেখিয়ে বলছিল ‘ঐ পাগল পথিক যাচ্ছে।’ নজরুল এসব গান মিছিলে গেয়েছিল। নজরুলের ব্যাপারে একটি জিনিস আমরা লক্ষ করেছি। যখন তার ‘বাঁধন-হারা’ পত্রোপন্যাসখানা কাগজে ছাপা হচ্ছিল তখন লোকেরা তাকে ‘বাঁধন-হারা’ কবি বলতেন। আবার ‘পাগল পথিক’ গানটি মিছিলে গাওয়ার পরে রাস্তার ছেলেরা তাকে ‘পাগল পথিক’ বলা শুরু করল। এই রকম আর কোন কবির ব্যাপারে ঘটেছে কিনা জানি না।

‘জাগরণী’

কোরাস :—

ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও !

ফিরে চাও ওগো পুরবাসী

সন্তান দ্বারে উপবাসী

দাও মানবতা ভিক্ষা দাও !

জাগো গো, জাগো গো,

তন্দ্রা-অলস জাগো গো,

জাগো রে ! জাগো রে !!

(১)

মুক্ত করিতে বন্দিনী মায়

কোটি বীরসুত ঐ হের ধায়

মৃত্যু-তোরণ-দ্বার পানে—

কার টানে ?

দ্বার খোলো দ্বার খোলো ।

একবার ভুলে ফিরিয়া চাও !

এ গানটিও নজরুল মিছিলের জন্মে কুমিল্লাতেই রচনা করেছিল এবং সে নিজে মিছিলে গানটি গেয়েওছিল, তবে লিখেছিল তার পরের বারে সে যখন কুমিল্লায় গিয়েছিল,—অর্থাৎ ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসে যখন ব্রিটেনের যুবরাজ ভারতে এসেছিলেন।

দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় এসে নজরুল বেশ কয়েকটি গীতি-কবিতাও লিখেছিল। তার কিছু কিছু কবিতার অংশ বিশেষ নীচে তুলে দিচ্ছি :—

পুলক

ওই সরষে ফুলে লুটালো কার হলুদ-রাঙা উত্তরী
 ঐ উত্তরী বায় গো আকাশ গাঙে পাল তুলে যায় নীল সে পরীর দূর তরী ॥
 তা'র অবুঝ বীণের সবুজ-সুরে
 মাঠের নাটে পুলক পুরে,
 ঐ গহন বনের পথটি ঘুরে বাজিয়ে বাঁশী আসছে দূরে কচি পাতা দূত ওরি ॥

দুপুর অভিসার

যাস্ কোথা সহি একলা ও তুই অলস বৈশাখে ?
 জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
 সাঁজ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই ঢুকল নাচায়
 পুকুর পানে ঝুমর ঝুমর নুপুর বাজায়
 যাসনে একা হাবা ছুঁড়ি
 অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই !
 ওলো রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
 দিগ-বধু কাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি,
 পিক বধু সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি
 আহা বউল-বাকুল মহল তরুর সরস ঐ শাখে ॥

“স্নেহাতুর”

এমন করে অন্তরে মোরে ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী ?
করে ও তুই করে, আহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা সুরে রে,—
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরে রে—
কোন পাগল স্নেহ সুরধুনীর আগল ভাঙালি !!

“রেশমী ডোর”

তোরা কোথা হতে কেমন এসে মণি-মালায় মত আমার কণ্ঠে জড়ালি ?
আমার পথিক জীবন এমন করে ঘরের মায়ায় মুগ্ধ করে বাঁধন পরালি ॥
আমায় বাঁধতে যারা এসেছিল গরব করে, হেসে,
তারা হার মেনে হায় বিদায় নিল কেঁদে
তোরা কেমন করে ছোট্ট বুকের একটু ভালোবেসে,
ক্ষীণ কচি বাহুর রেশমী ডোরে ফেললি আমায় বেঁধে !
আহা চলতে গেলে পায়ে জড়াস্
“না না” বলে ঘাড়টি নড়াস্,
কেন ঘর-ছাড়াকে এমন করে ঘরের ক্ষুধা স্নেহের সুখা মনে পড়ালি ? ॥

নজরুল সাহিত্য

আমি শুরুতেই বলে রেখেছি যে কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্য সমালোচনা আমার এ-পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমি কবির সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেছি। কাজেই তার সম্বন্ধে অনেক কিছু আমি জানি। যাঁরা কবির জীবনী রচনা করবেন তাঁদের জন্য কিছু কিছু মাল-মসলা জড়ো করে দেওয়াই আমার মূল উদ্দেশ্য। তার ওপরে, আজকাল বুর্জোয়া ভাবাদর্শে প্রভাবিত সুধীমণ্ডলী যাঁদের সাহিত্যবিৎ বলেন আমি তাঁদেরও একজন নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন :—

“কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গোড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি।”

আমি এই ‘গোড়জনে’র একজন। কবিরা যখন আমাদের জন্য কাব্য রচনা করেন তখন আমাদেরও তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে দরকার হলে দু’ এক কথা বলার অধিকার নিশ্চয় আছে।

কোন কোন সমালোচক বলেছেন, নজরুল ইসলাম কবিই নয়, কেবল একজন পদ্যকার। এই শ্রেণীর সমালোচকদের সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভালো। আমার মনে হয় না যে তাঁদের সমালোচনা কেউ গভীরভাবে নিয়েছেন। কিছু কিছু সমালোচক বলেছেন নজরুল ইসলাম একজন হুজুগের কবি। তাঁদের মতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্ত যে আন্দোলন ও সংগ্রাম করা হয় সে সব হুজুগ। সংগ্রামের স্থান হ’তে সর্বদা বহু যোজন দূরে থাকা ও গায়ে আঁচড়টি লাগতে না দেওয়া এবং স্বাধীনতা অর্জিত হলে

তার ফল পুরোপুরি ভোগ করাই তাঁদের মতে বিশুদ্ধ কবির লক্ষণ ! নজরুল ইসলামের সঙ্গে এই সমালোচকদের কোথায়ও মিল নেই । নজরুল সমাজের রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছে, আর এই সমালোচকরা যে-কবীদের সমর্থক তাঁরা চলতি সমাজ ব্যবস্থার আকৃতিতে নিজেদের গড়ে নিতে চেয়েছেন । কালের হুজুগ কেটে গেলে নজরুলের কাব্য টিকে থাকবে কিনা সে-বিচার কালই করবে । আমরা তো দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতা লাভের ১১।১২ বছর পরেও নজরুলের কবিতা খুব বেশীর ভাগ কবীদের অপেক্ষা বেশী বিক্রয় হচ্ছে । সর্বাপেক্ষা বেশী বিক্রয় হচ্ছে কিনা সে অনুসন্ধান করিনি । এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে দেশের মানুষ এখনও নজরুলকে চায় । আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা এই স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে পূর্ণ হয়নি । তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য, তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণ এখনও সংগ্রাম করে যাচ্ছে । কাজেই, তাঁরা আজও নজরুল ইসলামের লেখা হ'তে প্রেরণা পাচ্ছেন । বিশেষ শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন সমর্থক সমালোচকরা যে-জিনিসকে 'হুজুগ' বলে থাকেন তা এখনও কেটে যায়নি । আমরা যদি প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের দিকে নজর ফরাই তা হলে কি দেখতে পাই ? কবিরা রাজা-বাদশাহ্ ও উজীর নাজিরের অনুগ্রহে তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন । ছাপাখানা ছিল না । তা সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সব কাব্যকে কারা রক্ষা করেছেন ? দেশের অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকেরা । তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বলেই আজ এসব অমূল্য রত্ন আমাদের নিকটে পৌঁছেছে । তাঁরা শুধু প্রাচীন কাব্য সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখেন নি, পড়েছেনও । আমি ছোট বেলা আমাদের দেশে (আমি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সন্দ্বীপ নামক দ্বীপে জন্মেছি) দেখেছি কেবল অক্ষর স্তান বিশিষ্ট লোকেরা সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য পাঠ করছেন । দৌলৎ কাজী ও সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী কবি । এই দুই

জন কবি বাঙলা কাব্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আলাওল বাঙলা ভাষারও মোড় ঘুরিয়েছিলেন। তিনিই সংস্কৃত শব্দবহুল বাঙলা ভাষার প্রবর্তন করেছিলেন, জানতেন, তাতে বাঙলা ভাষার জোর বাড়বে।

ছোট বেলা ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের কিছুই বুঝিনি। এখন এখানে-সেখানে কিছু কিছু প’ড়ে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি যে প্রায় নিরক্ষর লোকেরা কি করে এ-কাব্য পড়তেন ও তার রসাস্বাদন করতেন। ‘পদ্মাবতী’র কয়েক ছত্র আমি নীচে তুলে দিচ্ছি :—

“কামের কোদণ্ড ভুরু অলখা-সন্ধান ।
 যাহারে হানয় বালা, লয় যে পরাণ ॥
 ভুরুভঙ্গ দেখি’ কাম হইল অতনু ।
 লজ্জা পাই’ তাজিল কুসুম-শরধনু ॥
 কদাচিৎ গগনে উদিলে ইন্দ্রধনু ।
 ভুরুভঙ্গ-দরশনে লুকায় নিজ তনু ॥
 ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি’ ভুজঙ্গ সকল ।
 ভাবিয়া চিস্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥
 প্রভাকর-বর্ণ অঁখি সূচাক নির্মল ।
 লাঞ্জে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল ॥
 কাননে কুরঙ্গ, জলে সফরী লুকিত ।
 খঞ্জন-গঞ্জন নেত্র অঞ্জন-রঞ্জিত ॥
 অঁখিতে পুতলী শোভে রত্ন সেতাস্তর ।
 ভুলিয়া কমল রসে বসিল ভ্রমর ॥
 কিস্কিৎ লম্বিতে মাত্র উথলে তরঙ্গ ।
 অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে হয় মুনি-মন ভঙ্গ ॥”

এই কাব্য যদি প্রায় নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিত লোকদের দ্বারা কয়েক শ’ বছর রক্ষিত হয়ে থাকে তখন মুদ্রণ যন্ত্রের যুগে আমাদের দেশের জনগণের নিকটে নজরুল ইসলামও বেঁচে থাকবে।

কেউ কেউ বলেছেন নজরুল ইসলাম শুধু জনতার নিকটে আবেদন করেছে, জনগণের সান্নিধ্যে সে কখনও পৌঁছুতে পারেনি। এটা একেবারেই ভুল কথা। রাস্তার মোড়ের জনতার সঙ্গে নজরুলের কোনও কারবারই ছিল না। সে মানুষ হয়েছে জনগণের ভিতরে, প্রেরণাও সে পেয়েছে তাঁদেরই নিকট হতে। লেটোর দলে সে গান গেয়েছে। এই গান শুনে আনন্দ পেয়েছেন কৃষক ও মজুরেরা। আসানসোলে রুটির কারখানায় সে মজুরী করেছে। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে জানা যায় যে রানীগঞ্জে রেলওয়ের গার্ড সাহেবের বাড়ীতে সে বাবুটির কাজও করেছে। তার জন্মস্থান আসানসোল মহকুমায় কৃষকেরা তো ছিলেনই, এই স্থানটি ভারতের মধ্যে একটি বিশাল কয়লা খনির এলাকাও। কৃষক ও মজুরের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

শ্রীযুক্ত অভুল গুপ্ত নজরুল-নিরাময় কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাঁকে এক সভায় বলতে শুনেছি, কলকাতার মিরজাপুর এলাকার দফতরি কারখানার মজুরেরা পর্যন্ত নজরুলকে ইউরোপে চিকিৎসার জন্যে পাঠাতে চাঁদা দিয়েছেন। প্রতি বৎসর নজরুলের জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। কারখানার মজুরেরাও এই জন্ম বার্ষিকী পালন করেন। এবারেও (১৩৬৬) চেঙ্গাইল চটকলের মজুরেরা নজরুল জন্মতিথি পালন করতে যাচ্ছেন। নজরুল ইসলাম জনগণের নিকটে আবেদন করেছিল বলেই তো জনগণ বছরে বছরে তাকে স্মরণ করছে।

এখানে আমি নজরুল ইসলামের বন্ধু কৃতী লেখক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা হ'তে কিছুটা তুলে দিচ্ছি :—

“নজরুলের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে, তার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা দিতে হলে, আমাদের সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে, সেই কথাকে, নজরুল জন্মেছিল রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী নিশ্চিহ্ন প্রতিভার পূর্ণ প্রভাবের যুগে এবং সে যুগের প্রত্যেক তরুণ সাহিত্য-প্রয়াসীর

মত সে আকর্ষণ পান করেছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য সূধা। শুধু তাই নয়, সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে সে ডুব দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গানে আর রবীন্দ্রনাথের সুরের গভীরে, তেমন করে রবীন্দ্রনাথের আলোয় সমস্ত চেতনাকে রাঙিয়ে তুলতে আজকের যুগের তরুণদের দেখি না। কিন্তু নজরুল-প্রতিভার অনন্য সাধারণত্ব ও স্বাভাব্য হলে, যখন সে কবিতা লিখলো, যখন সে নিজে গান রচনা করলো, সুর সৃষ্টি করল, তখন তার কবিতার একটা অক্ষরের মধ্যে, তার গানের একটা আন্দোলনের মধ্যে, তার সুরের একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে, তার প্রকাশের ক্ষীণতম ভঙ্গীর মধ্যে, এমন কি তার ভাষার রীতির মধ্যে কোথাও দেখা গেল না রবীন্দ্র-প্রতিভার বিন্দুমাত্র প্রভাবের লক্ষণ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্ভ্রান্ত চেফ্যার রবীন্দ্র-প্রতিভার আওতার বাইরে যে কিছুটা যায়নি, তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটা প্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত চেফ্যার, নজরুলের এই স্বাভাব্যতার মধ্যে নেই ক্ষীণতম সম্ভ্রান্ত চেফ্যার লক্ষণ। এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে, সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে, সুর-স্রষ্টাদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে পেরিয়ে গিয়েছে রবীন্দ্র-প্রভাবের মন্ত্রপূত গম্ভীর।.....

.....অনেক ভাল কবির মধ্যে নজরুল শুধু একজন ভাল কবি নয়, অনেক ভাল গায়কের মধ্যে নজরুল শুধু একজন ভাল গায়ক নয়, অনেক ভাল সুরকারের মধ্যে নজরুল শুধু একজন ভাল সুরকার নয়; বাংলা কাব্য-সাহিত্যে, বাংলার সঙ্গীতে, বাংলার সুর-স্রজন-লোকে নজরুলের নেই কোন পিতৃ-পুরুষ, নেই কোন উত্তরাধিকারী। সে দাঁড়িয়ে আছে স্বতন্ত্র, একক, একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যক্তিত্ব ও শক্তি।” (“কবি নজরুল, সংস্কৃতি পরিষদ, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা)।

সাহিত্য সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়েও আমি বলব, আমাদের বাংলা ভাষা চিরকাল নজরুল ইসলামের নিকটে ঋণী থাকবে। আমাদের ভাষা মিষ্ট। আমাদের ভাষা সুকোমল। শ্রেষ্ঠ গীতি

কবিতা আমাদের ভাষায় রচিত হতে পারে, এই ছিল আমাদের ধারণা। আমাদের ভাষায় জোর নেই সংগ্রামশীলতা নেই, এই ধারণা আমাদের ভিতরে বদ্ধমূল ছিল ব'লেই আমরা শ্লোগান দিতাম হিন্দুস্তানীতে। নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে আমরা বুঝেছি যে বাংলা ভাষাও জোরালো, সংগ্রামশীল ও অসীম শক্তিশালিনী। তার “প্রলয়োল্লাস” প্রভৃতি কবিতায় এত বেশী জোর যে পড়বার সময়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। বাংলা ভাষাকে নজরুল ইসলাম কাবুলি নাচ নাচিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নজরুলের সামরিক শিক্ষা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মিশে যাওয়ার তার কলম হ'তে এত জোরালো ভাষা বের হওয়া সম্ভব হয়েছে। নজরুলের দ্বারা পথ প্রদর্শিত হওয়ার পরে অনেকেই সচেতন হলেন যে বাংলা ভাষার ভিতরেও সংগ্রামশীলতা আছে। তার পরে বহু কবি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং সংগ্রামশীল ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু নজরুলই তার পথিকৃত একথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

নজরুলের আধ্যাত্মিকতা

লগুন ও ভিয়েনার ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে নজরুল ইসলামের মস্তিষ্কে অনেক সব কালো দাগ পড়ে গেছে। আজ নজরুল যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাঁর মস্তিষ্কের এই রোগই তার জন্মে দায়ী। মস্তিষ্ক মানুষের মনন-ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় বিকল হলে মানুষের মনন-শক্তিও বিকল হয়ে যায়। কোন্ রোগ হ'তে কবির মস্তিষ্কে কালো দাগগুলি পড়েছে তার অনুসন্ধান আমি করব না। তবে, এটা নিশ্চিত যে সব ক'টি কালো দাগ একদিনে পড়েনি। ধীরে ধীরে তা বিস্তার লাভ করেছে। আমার বিশ্বাস তার রোগের প্রথম সংক্রমণ তার মননে যে দুর্বলতার সৃষ্টি করেছিল সেই দুর্বলতাই তাকে আধ্যাত্মিকতার দিকে টেনেছিল।

আমার এক মুসলিম বন্ধু ছিলেন। তিনি সরকারের অধীনে বড় চাকুরী করতেন। আমরা ধার্মিক মুসলমান বলতে যা বুঝি তিনি কখনও তা ছিলেন না। নমাজ-রোজার ত্রিসীমায়ও তিনি কোনো দিন ঘেঁসতেন না। একবার তিনি চিকিৎসা করবার জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতা এলেন। আমরা দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে তিনি নমাজ পড়ছেন তো পড়ছেনই, কিছুতেই নমাজের বিছানা ছেড়ে উঠে আসছেন না। তাঁর উৎকট প্রার্থনা তাঁর রোগ-মুক্তি ঘটাবে এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কিছু স্ববুদ্ধি তখনও অবশিষ্ট ছিল। বিশিষ্ট চিকিৎসক তাঁর রোগের চিকিৎসাও ক'রে যাচ্ছিলেন। রোগটিও আরোগ্য হওয়ার মতো ছিল। স্বচিকিৎসার ফলে আমার এই বন্ধুটি আরোগ্য লাভ ক'রেছিলেন। তার পরে দেখা গেলো নমাজ পড়া তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহারের

সঙ্গে মস্তিস্কের রোগাক্রান্ত নজরুল ইসলামের ব্যবহারের খানিকটা মিল দেখা যায়।

নজরুল ইসলাম মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সমাজের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস—মার্কসবাদের এই মৌলিক কথাটি সে মানত। তার কবিতায় সাম্যবাদের সুর আছে। সাম্যবাদের দর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। একই সঙ্গে এই দর্শনে বিশ্বাসী ও অধ্যাত্মবাদী কেউ হ'তে পারেন না। অথচ, নজরুল ইসলাম আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। যে-ছাত্ররা নজরুল ইসলামের সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এটা কি ক'রে সম্ভব হলো? এর উত্তর আমি ওপরে দিয়েছি, অবশ্য তা আমারই উত্তর। অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন না জেনেও আমি বলব নজরুল যখন আধ্যাত্মিক সাধনা করতে গিয়েছিল তখন সে পরিপূর্ণরূপে সুস্থ ছিল না। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কোনো কোনো সূত্র সে মানত ঠিকই, কিন্তু এই দর্শনটি কখনও সে যে আয়ত্ত করেনি একথাও ঠিক।

নব পর্বাণের “নবযুগ”—এ “আমার সুন্দর” শিরোনাম দিয়ে নজরুল ইসলাম একটি আত্ম-বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ লিখেছিল। তা থেকেও আমি যা বলছি তার সমর্থন পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিকতায় সে যে ডুব দিতে গিয়েছিল তা যেন নিজের ইচ্ছায় নয়, কিছু যেন জোর ক'রে তাকে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার সন্নিহিত ফিরে এসেছে। তখন সে নিজেকে ফেরাবার চেষ্টা করেছে। সে বলেছে—“আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথীমাতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙ্গলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্তে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুস্থের পীড়নে তিনি জর্জরিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈত্য দানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার

ক'রে বললাম, “আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ চাই না, ভগবান চাই না। এই সব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দিবেন। আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী মাতার ঋণ আছে। আমার বন্দিনী মাকে অস্বরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার ক'রে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, শাস্তি নেই।” এখানে আবার সত্যকার নজরুল ইসলামের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত কয়েক দিন যেতে না যেতেই সে মস্তিস্কের পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। রোগের প্রথম আঘাত সে কাটিয়ে উঠেছিল। পরে ধীরে ধীরে আবার রোগের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনোবিকারও দেখা দেয়। তার পরে তো সে আজকার অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

১৯৩৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বন্দী দশা হ'তে মুক্তি পেয়ে এসে আমি নানান কাজে ডুবে যাই। তবুও ১৯৩৬ সালে আমি মাঝে মাঝে নজরুলদের বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে আমি সারাক্ষণ পুলিশের চরদের দ্বারা অনুসৃত হতে থাকি। এই চরদের সঙ্গে নিয়ে কোনও বন্ধুর বাড়ী যাওয়া চলত না। এই কারণে নজরুলদের বাড়ী যাওয়াও আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার মাঝে মাঝে যাওয়া চলত যদি সক্রিয় রাজনীতিতে তখনও নজরুলের যোগ থাকত। তা ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে আমায় দীর্ঘকাল গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল। তারপর আমি ফিরে এসেছিলাম ১৯৪২ সালের শেষ দিকে। আমার ফেরার আগেই নজরুল রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। আমার ফিরে আসার পরে দেখতে গেলে নজরুল আমাদের চিনতে পারত, কথাও সে বলতে পারত, বলত তার বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বেশীক্ষণ কথা বলতে পারত না। তার এই অবস্থায়ও ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ হতে গ্রাম-সঙ্গীত পরিচালনার জন্য তাকে চাকুরি দিতে চেয়েছিল,-

মোটা বেতনের চাকুরি। কিন্তু নজরুলের এই কাজ করার মত অবস্থা ছিল না। তার পরে তো তার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটেছিল।

মোটের ওপরে, নজরুল ইসলামের আধ্যাত্মিকতার পুরো যুগটাই আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। বিচ্ছিন্ন না থাকলেও তাকে হয়তো এই পথ হ'তে ফেরাতে পারতাম না, কিন্তু চেফ্টা তো করতে পারতাম।

শেষ কথা

আমার স্মৃতিকথা আমি এখানে শেষ করলাম। অনেক জানা কথার উল্লেখ আমি করিনি, আবার অনেকের নামোল্লেখও করা হয়নি। নজরুল ইসলামের ছাত্র-জীবনের অনেক বন্ধু আমাদের বাসায় আসতেন। আমি শুধু শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলেছি, কিন্তু তার সঙ্গে যে শৈল ঘোষও আসতেন তা বলা হয়নি। তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন। নজরুল দু'জনকেই শৈল ভাকত,—এক জন ঘোষ, আর এক জন মুখোপাধ্যায়। শৈল ঘোষ নজরুলকে খুব ভালবাসতেন। পরে তিনি কোথায় যে তলিয়ে গেলেন কিছু বোঝা গেলো না। একজন ছাত্র আসতেন, নাম আবদুল জব্বার। ক'বছর আগে একদিন তাঁকে দেখেছিলাম! ব্যবসায় করেন। সিউড়ীর আবদুল জলীল সাহেবও আসতেন। তিনি বোধহয় নজরুলদের আত্মীয়। যুদ্ধের সময়ে শুনেছিলাম, তিনি মুসলিম লীগের নেতা। নজরুলদের দেশের আরও অনেকে আসতেন। এখন নাম ভুলে গেছি।

একবার চাটগাঁ হতে নজরুল সন্দ্বীপে আমাদের বাড়ী গিয়েছিল। আমার দুই ভাই-পো তখন চাটগাঁ কলেজে পড়ত। তারাই নজরুলকে সন্দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল। একথা আজ্জহার উদ্দীন সাহেব তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, আরও কেউ কেউ বোধ হয় লিখেছেন। কাজেই, এসম্বন্ধে আর কিছু লেখার নেই। লিখবই বা কি করে? আমি তো আর সেখানে ছিলাম না।

শ্রীশান্তিপদ সিংহের কথা আগে বলেছি। শান্তি যখন ষোল-সতের বছরের ছেলে ছিল তখন তাঁদের বাড়ীতে অনেক গিয়েছি, অনেক

খেয়েছি। তার দিদি নিজে মুরগীর মাংস রেঁধে আমাদের খাওয়াতেন। সেই দিদি যখন বিধবা হলেন তখন তিনি একদিন নজরুলদের বাড়ীতে আমায় পাঁউরুটি কেটে দিলেন না, বললেন তাতে ডিম মেশানো আছে। তাঁকে অনেক ক’রে বোঝানো হলো যে পাঁউরুটিতে ডিম মেশানো হয় না, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা মানলেন না। শান্তিরা নজরুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। সে একটি ইউরোপীয় ফার্মে বড় চাকুরী করত। সেখানে থেকে অবসর গ্রহণ করে অন্য একটি ইউরোপীয় ফার্মে এখন সে কাজ করছে। তার এ-চাকুরীও বড়।

নজরুলের দুই ছেলে, কোনও মেয়ে নেই। বড় ছেলের নাম কাজী সব্যসাচী ইসলাম। সে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে কাজ করে। ছোট ছেলে কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম শিল্পী। গীটার-বাজিয়ে হিসাবে সে খ্যাতি অর্জন করেছে। অনেকে তার কাছে গীটার বাজানো শিখতে আসে। নজরুল বড় ছেলের ডাক নাম রেখেছিল সুনুইয়াত সেন! সকলে তাকে ‘সানি’ নামে ডাকে। নজরুল তার ছোট ছেলের ডাক নাম রেখেছিল লেনিন। সকলে তাকে এখন ডাকে লিনি। দু’টি ছেলেই বিবাহিত, দু’জনাই সন্তানের পিতা।

নজরুলের স্ত্রী প্রমীলাকে ১৯২১ সালে প্রথম দেখেছি কুমিল্লায়। ছোট মেয়ে ছিল। ১৯২৪ সালে নজরুলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, আর এখন ১৯৫৯ সাল। প্রমীলা বার্ষিক্যে পা দিয়েছে। নজরুলের বয়স ৬০ বছর পুরো হবে ১১ই জৈষ্ঠ (২৫শে মে) তারিখে। আমারও বয়স ৭০ বছর পুরো হতে চলেছে। আমার চোখের সামনে কী ঝড়ই না বয়ে গেলো নজরুলের পরিবারের ওপর দিয়ে! অফুরন্ত জীবনী-শক্তি ও প্রাণচঞ্চলতা ছিল নজরুলের। সবাইকে আনন্দ বিলানোই ছিল তার কাজ; সেই নজরুল আজ হয়ে গেছে জড়বৎ, তার প্রাণ-খোলা হাসি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। আর প্রমীলা? বহরের পর বছর সে বিছানায় শুয়েই আছে, তার অর্ধ অঙ্গ অবশ। সে নিজের

কথা কি ভাবছে কে জানে, কিন্তু শুয়ে শুয়ে দেখছে তার সর্বজনপ্রিয় স্বামীর অবস্থা। একবার অনেক দিন পরে ওদের দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন তার স্বামীর কথা সে বলল, “দেখুন দাদা কি মানুষ কি হয়ে গেছে।” সব কিছু সে নীরবে সহ করেছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। শুয়ে শুয়েও সে কত কাজ করেছে, আমরা গেলে আমাদের চা পর্যন্ত তৈরী ক’রে খাওয়ায়।

স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বই বগলে নিয়ে দলে দলে আসে, তারা কবিকে দেখবে। তারা দেখেও যায় কবিকে, বড় হয়ে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বলবে কবি নজরুল ইসলামকে তারা দেখেছে। তারা কিন্তু দেখছে একটি নির্বাক মানুষকে, যে ফ্যালফ্যাল ক’রে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। যে-নজরুল ইসলাম তাদের জন্য কবিতা লিখেছে সে ছিল অন্য লোক। কী দুঃখ যে সেই অসীম প্রাণবন্ত নজরুলকে তারা একবার দেখতে পেলো না, শুনতে পেলো না একবারও তার দিল-খোলা হাসি।

নজরুলকে যখন দেখি, প্রমীলাকে যখন দেখি, তখন আমার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তবুও আমি কামনা করি, একান্ত মনে কামনা করি, ওরা যেন বেঁচে থাকে।

নজরুলের জীবনী রচয়িতাদের নিকটে আবারও আমি আবেদন জানাই। শুধু আমার নিকটে আসলে কিংবা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে গেলে নজরুলের পুরো জীবনী তাঁরা রচনা করতে পারবেন না। নানান জায়গায় তাঁদের যেতে হবে নানান লোকের নিকটে। “ভারতী”র দলের কারুর নিকটে তাঁরা কি গিয়েছেন? শ্রীযুত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় এখনও বেঁচে আছেন। আফ্জালুল হক সাহেবের নিকটে কিংবা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে কেউ কখনোও গিয়েছে বলে তো মনে হয় না। থিয়েটার সিনেমারও একটি জগৎ আছে। সে-জগৎ হ’তেও খোঁজ-খবর নিতে হবে। গ্রামোফোন কোম্পানীর অনেক

কর্মচারী হয়তো বেঁচে আছেন যাঁরা অনেক কিছু বলতে পারবেন। দেখা
করা দরকার শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটকের সঙ্গেও। আসানসোল মহকুমায়
তাদের ঘুরতে হবে, যেতে হবে তাঁদের ঢাকায়। তাঁদের সতর্কও থাকতে
হবে। লোকের বড় স্মৃতি-বিভ্রম ঘটে। অনেকে আবার নজরুলের কথা
না বলে নিজেদের কথাই বলবেন। অপরিসীম ধৈর্য থাকা চাই।

১৮ই মে, ১৯৫৯

সমাপ্ত

